সচলায়তন 'জ্বীনওভূততত্ত্ব' গল্প সংকলন

ডরাইলেই ডর...

প্রকাশায়তন

বৈশাখ ১৪১৯

“ডরাইলেই ডর...”

সচলায়তন ‘জ্বীনওভূততত্ত্ব’ গল্প সংকলন

বৈশাখ ১৪১৯

প্রকাশায়তন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ আন্তর্জাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করার আগে প্রকাশকের অনুমতি প্রয়োজন।

“ডরাইলেই ডর...”

সচলায়তন ‘জ্বীনওভূততত্ত্ব’ গল্প সংকলন, বৈশাখ ১৪১৯

প্রথম আন্তর্জাল সংস্করণ

বৈশাখ ১৪১৯ | মে ২০১২

প্রকাশক

প্রকাশায়তন | সচলায়তন ডট কম

© সচলায়তন ডট কম

www.sachalayatan.com

contact@sachalayatan.com

ebook.sachal@gmail.com

প্রচ্ছদ

তৃষিয়া নাশতারান

অলঙ্করণ

আঁকাইন, তৃষিয়া নাশতারান

অঙ্গসজ্জা

শাহরিয়ার মামুন

সমন্বয়ক

যাযাবর ব্যাকপ্যাকার

‘Dorailei Dor: Sachalayatan Jeen-o-bhut-totto Golpo Shongkolon’ - a collection of Bangla fictions, published by Prakashayatan, sachalayatan.com, first internet edition published on Baishakh 1419, May 2012.

মুখবন্ধ

বৈশাখের লু হাওয়ায়, ধুলো, গরম, লোডশেডিঙের যন্ত্রণার অস্থিরতা দূর করতে প্রতি বৈশাখে নববর্ষের বারতা নিয়ে *অনলাইন রাইটার্স কমিউনিটি* **সচলায়তন**- এর ঐতিহ্য একটি চমৎকার ই- বই প্রকাশ করা। সচলদের সম্মতিক্রমে ১৪১৯- এর বৈশাখের সচলায়তন সংকলনের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছিল **'জ্বীনওভূততত্ত্ব'**।

সেই ছোটবেলার গা ছমছমে গেছোভূতগুলো নাকি ইদানীং কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে। মেছোভূত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নদী- পুকুর- বিল ভরাটের সাথে সাথে। ওদিকে বাঁশঝাড়ের পাশাপাশি গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে জ্বীনেরা। এইসব আশঙ্কায় আঁতকে উঠে সচলেরা এগিয়ে এসেছেন তাদের স্মৃতির আর অভিজ্ঞতার জ্বীন- ভূতেদের আগলে রাখতে।

এদিকে দুষ্ট লোকে ঠোঁট উল্টে আজকাল 'তেনাদের' অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে! কম্পুঘাঁটা শহুরে বাচ্চারা গুগল ঘেঁটে গালগপ্পো বলে ঠাট্টা করে গ্রামবাংলার প্রাচীন সব চিরায়ত সত্যকে! আর তাই ভীষণ কর্মব্যস্ততার মাঝেও সচলেরা সচেষ্ট হন নিজেদের অদ্ভুতুড়ে গল্পগুলো লিখে ফেলতে। তাদের সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল আমাদের এবারের বৈশাখের সচলায়তন সংকলন। ধন্যবাদ সচলায়তনের লেখক, পাঠক সবাইকে এই ই- বইয়ের পেছনে উৎসাহ দেয়ায়। আপনাদের আন্তরিকতাতেই সফলতা এই প্রচেষ্টার।

কিন্তু... 'তেনারা' কি আসলেই আছেন? রাতবিরেতে নাম কি সত্যিই নিতে নেই...! একা একা তেমন দিনে তেমন জায়গা দিয়ে সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফিরতেও কি নেই তাহলে! আর সেই গল্পগুলো, যেখানে 'তেনারা' নাকি হাসিখুশি আর সাহায্যপরায়ণ, সে সব কি তবে মিথ্যে? এই সবকিছুর জবাব খুঁজতেই এবারের বৈশাখের সচলায়তন সংকলন **'ডরাইলেই ডর...'**

যাযাবর ব্যাকপ্যাকার

সচলায়তন ডট কম

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কটকটে-
দেখছে নেড়ে ঝুণ্টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চটপটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশখ্যাঁশানি শব্দে যেমন করাৎ দিয়ে কাঠ চেরে!
যেমন খুশি মারছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাংদোলা।
বলছে আবার, "আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ না ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম- হাসি মুখ ক'রে!"

"*ভুতুড়ে খেলা*", সুকুমার রায়, আবোল তাবোল

সূচিপত্র

মাউচ্ছা দেও	নীড় সন্ধানী	১
সেই সব ভূতেরা!	নির্জন স্বাক্ষর	৪
পনেরোই জুন	আনোয়ার সাদাত শিমুল	৮
শুক্লপক্ষ	ধুসর গোধূলি	১৪
ভূত একটি ভ্রান্ত ধারমা মাত্র	নজরুল ইসলাম	১৮
মাউবর চাচার জ্বীন	প্রকৃতিপ্রেমিক	২০
হারিয়ে যাওয়া ভূতেরা আমার	তারেক অণু	২৩
ভুড্ডুতুড়ে	আশালতা	২৫
অ(লৌকিক)	যাযাবর ব্যাকপ্যাকার	২৮
ভূতানুভূতি	চরম উদাস	৩৫
যে রাতে ওনার সাথে দেখা হলো	ওডিন	৩৮
কানামাছি	সুলতানা পারভীন শিমুল	৪৩
ব্রহ্মদত্যির গল্প	সত্যপীর	৪৬
ভূত	তাসনীম	৪৯

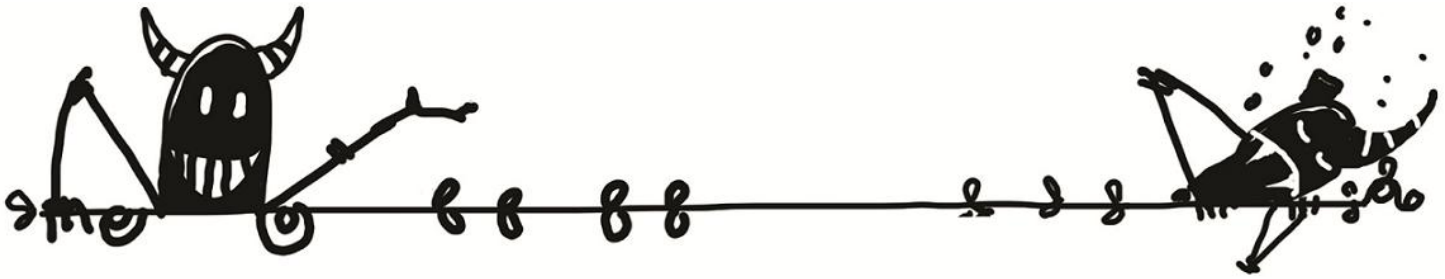

মাউচ্ছা দেও

নীড় সন্ধানী
hrrh69@gmail.com

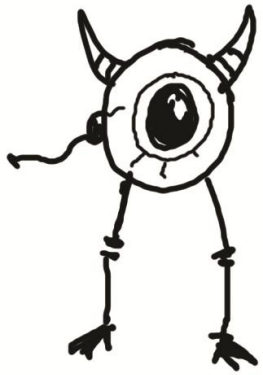

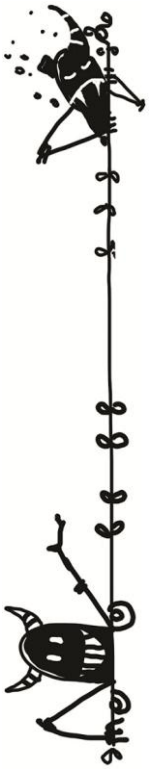

মেজো মামা বলতেন, ওনার দাদা জ্বীনভূত সমাজের আতংক ছিলেন। তাঁর ভয়ে এলাকার তাবৎ জ্বীনভূত সুদূর বার্মায় পগারপার হয়েছিল। তিনি দুষ্টু জ্বীনদের ধরে ধরে বোতলবন্দি করে রাখতেন। তাই জ্বীনসমাজ ওনার উপর খুবই ক্ষেপে ছিল। জ্বীনদের সর্দার ওনাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, আমাদের অনেক ক্ষতি করেছিস তুই, তোকে কোনোদিন ধরতে পারলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো, আর তোকে না পেলে তোর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন ধ্বংস করে ফেলবো আমরা। মনে রাখিস কেয়ামত পর্যন্ত জ্বীন জাতির মৃত্যু নাই।

উনি নিজে এসব হুমকিতে ভয় না পেলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশে সাবধানবাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন, তাবিজতুমার রেখে গিয়েছিলেন। তিন পুরুষ ধরে মামারা তাই সাবধানে আছেন। তিন পুরুষের গত একশো বছরে জ্বীন সমাজের কেউ তেমন বিরক্ত না করলেও চতুর্থ পুরুষে এসে মামার দুই ভাগ্নে জ্বীনের খপ্পরে পড়লো।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে। প্রতিবছর স্কুল ছুটি হলেই নানাবাড়ি চলে যেতাম। অন্য খালাতো মামাতো ভাইয়েরাও আসতো। বিশাল জমজমাট আড্ডা হতো নানাবাড়িতে। আমার চেয়ে দুবছরের বড় খালাতো ভাই আজাদ। পড়াশোনায় গণ্ডমূর্খ হলেও বন জঙ্গল পশুপাখি ইত্যাদিতে ডক্টরেট। গ্রামে গেলে ওর পিছে পিছে ঘুরে বেড়াতাম জংলা জায়গাগুলোতে। আজাদ একটু অশরীরীভক্ত। পীর ফকিরেও আসক্ত। সে জানে কীভাবে জ্বীনভূতের উপদ্রব কাটিয়ে নির্জন দুপুরে শ্মশানের পাশ দিয়ে নদীতে নেমে ডুব দিয়ে আসা যায়, কীভাবে অমাবস্যার রাতে পেত্নীদের ফাঁকি দিয়ে তেপান্তরের বুড়ো বটগাছটার তল দিয়ে হাট থেকে বাড়ি ফেরা যায়। গ্রামে গেলে আমি তাই আজাদের সাথে ঘুরে বেড়াতাম নিরাপত্তার আবরণ হিসেবে।

একদিন আজাদ বাড়ি ফিরল খুব রাত করে। বাড়ির সবাই চিন্তায় কাহিল। বাড়ি ফেরার পর চেরাগের আলোয় দেখা গেল আজাদের চোখ টকটকে লাল। তার কণ্ঠ দিয়ে যে স্বর বেরুচ্ছে তা অচেনা কারো। ভয়ে সবাই দূরে রইল। ওর বড় আপা কাছে গিয়ে ভাত খেতে বললে সে নাকিসুরে বলল, "আঁজ রাঁতে আমি ভাঁত খাঁবো না, কাঁচাঁ মাঁছ খাঁইছিঁ বাঁজাঁরেঁ।" তাজ্জব কথা! বাজার থেকে কাঁচা মাছ খায় কেন সে। মেজো মামাকে খবর দেয়া হলো। মেজো মামা খুব সাহসী হলেও আজাদের ঘটনা শুনে হাতে দাদার দেয়া মাদুলি বেঁধে তার সামনে আসলো।

মামাকে দেখে আজাদ চুপ গেল। নাকিসুরের কথা বন্ধ হলো। কিন্তু স্বাভাবিক কোনো জবাবও দিচ্ছে না। কেবল চোখ লাল করে এদিক সেদিক তাকায়। কিছু খুঁজছে। সবাই ঘিরে আছে ওকে। সমস্ত পাড়া জুড়ে ফিসফিস। এক বুড়ি নানী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওরে আজাইদ্যারে 'মাউচ্ছা দেও'তে পাইছে রে।

এই দেও ছাড়াতে ওঝা লাগবে। কিন্তু এত রাতে ওঝা ডাকতে যাবে কে? রাতটা কাটুক তবে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রাত কাটবে কী করে? আজাদ ঘুমাবে কোথায়? আমার দিকে চোখ ঘুরলো সবার। নানাবাড়িতে গেলে আমি আজাদের ছায়াসঙ্গী। একই বিছানা শেয়ার করি। সামনের ঘরে পাটি বিছিয়ে শুই।

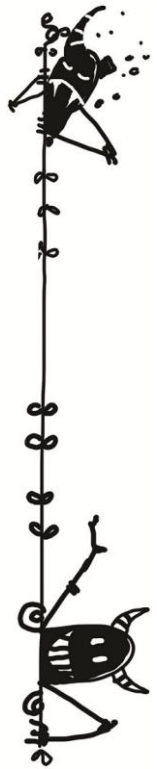

আমি জড়সড় হয়ে বললাম, "আজ আমি ভেতরের ঘরে ঘুমাব।" তাহলে কে ঘুমাবে? ওকে একা ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না। চোখে চোখে রাখতে হবে সারারাত। ঘরে বাতি নেভানো চলবে না। তখন গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি যায় নি, শুধু হারিকেন আর কেরোসিন কুপি জ্বলত। আলো নিভে গেলে মেছো ভূত আবার কার ঘাড়ে চেপে বসে। যে আজাদকে আমি এত পছন্দ করি, সেই আজাদকে আমার খুব অচেনা কোনো প্রাণী মনে হলো। ওর শরীর থেকে সত্যি সত্যি মাছের আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছিল। গা গুলিয়ে উঠলো আমার।

আজাদকে রাতে পাহারা দেবার জন্য পাড়ার শক্ত সমর্থ কয়েকজনকে এনে রাখা হলো সামনের ঘরে। সারারাত সব ঘরে চেরাগ আর হারিকেন জ্বালানোর মতো কেরোসিন ছিল না ঘরে। হাটবার আসার আগে কেরোসিন কেনাও যাবে না। তাই ঠিক হলো সামনের ঘরে শুধু একটা কুপি জ্বলবে, আজাদকে সেই কুপির আলোর আওতায় রাখা হবে। আলোর মধ্যে দেওদানব খুব সুবিধা করতে পারে না।

মাঝরাতে আজাদ নাকিসুরে জানালো তার বাথরুম পেয়েছে। তখনকার দিনে গ্রামের বাথরুম থাকতো বাড়ি থেকে একটু দূরে। নানাবাড়ির বাথরুমটাও কয়েকশো গজ পেছনে। গা ছমছমে জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। জঙ্গলের একপাশে কবরস্থান, অন্যপাশে পায়খানা। দিনের বেলায়ও সেই কবরস্থানে সূর্যের আলো ঢোকে না।

আজাদকে নিয়ে কে যাবে ওই জঙ্গলে? তিন জোয়ানের একজনও রাজি না। বাতাসে কুপি বাতি নিবে যাবে যেকোনো সময়। তখন কে সামলাবে ওকে! ওদিকে আজাদ নাকিসুরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে তার খুব বেশি পেয়েছে নইলে ঘরেই করে দিচ্ছে বড় বাথরুম। নিরুপায় হয়ে তিনজনে একসাথে বেরুলো। কুপি বাতিকে যথাসম্ভব বাতাস থেকে আড়াল করে হাঁটছে ওরা। দোয়াদুরুদ পড়ে চিৎকার করতে করতে সারা পথ এগিয়ে গেল ওরা। তবে ওর বড় কাজ সারা হলো কোনো বিপদ ছাড়াই। ঘরে ফিরে আজাদ কুপির আলোয় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে এলাহি কাণ্ড। ওঝা ডেকে আনা হলো। আজাদকে উঠোনে বসিয়ে তার সামনে একটা বিশাল চুলা জ্বালানো হলো। গনগনে আগুনের উপর বসিয়ে দেয়া হলো ইয়া বড় একটা ডেকচি। ডেকচিতে টগবগ করে ফুটছে লাল রঙের পানি। কী এক লতাপাতা পিষে পানিতে দেয়ার পর ওটা রক্তলাল হয়ে গেছে। আজাদের চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। সকাল থেকে সে কারো সাথে কথাবার্তা বলে নি। কেবল চুলার চারপাশ ঘুরে আসছে খানিক পরপর। ওঝাকে সন্তুষ্ট মনে হলো। মামার কানে কানে বলল, দেখেছেন পালানোর জন্য ছটফট করছে জ্বীনটা। আরেকটু দেখেন পানিটা আরো লাল হবে। তখন বাপ বাপ করে পালাবে।

পানি আরও লাল হতে হলো না। আজাদ খানিক পর এসে ওঝার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি বুঝি আমার জন্য চা বানাচ্ছো ওস্তাদ?"

ওঝা লাফ দিয়ে উঠলো, "এই ছাড় ছাড়। দূর হ আমার সামনে থেকে। তোরে আজ আগুন দিয়ে গোসল দেয়াবো।"

আজাদ হো হো হো করে হাসতে থাকে। আরো জড়িয়ে ধরতে চায় ওঝাকে। ওঝা ধস্তাধস্তি শুরু করলো ওর সাথে। কিন্তু আজাদ ওঝার লুঙ্গি ধরে টানাটানি করতে শুরু করলে ওঝা হাতের ঝাড়ু দিয়ে মার শুরু করলো। মার খেয়ে আজাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে পাশের গোবরের স্তূপ থেকে একতাল গোবর এনে ওঝার মাথা বরাবর ছুঁড়ে মারল। ওঝার সমস্ত শরীর গোবরে মাখামাখি। আজাদকে আরো গোবর নিয়ে ছুটে আসতে দেখে সে এক ছুটে পাশের পুকুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা হুলস্থুল ছোটাছুটি শুরু হলো উঠোনে।

এসব হুড়োহুড়ি চলার সময় আজাদ আমার হাত ধরে বলল, চল পালাই। আমি আজাদের মেছো ভূতের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম দিনের আলোয়। দুজনে এক ছুটে পেছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। তার মধ্যে আছে একটা বিশাল পুকুর। এই পুকুরপাড়টা আমাদের লুকোনোর জায়গা। এই পুকুরটা কেউ ব্যবহার করে না। চারপাশে ঘন গাছপালা ঝোপঝাড়ে ভর্তি বলে দুপুরে ফলমূল চুরি করে

এনে খাবার জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। খেয়াল করলাম আজাদের গলা স্বাভাবিক, সেই নাকি স্বরটা নেই আর।

আজাদ ফিসফিস করে বলল, "কালকে খুব মজা করছি হাটে..." সব ঘটনা জেনে আমি হেসে কুটি কুটি।

সে হাটে গিয়েছিল ঠিকই। বসে জেলেদের সাথে আড্ডা দিয়েছে, ওদের সাথে খাওয়াদাওয়া করে ভাঙ টেনেছে। নেশা করেছে। মাছ রাখার মাচায় গড়াগড়ি খেয়েছে ইচ্ছেমতো। বাড়ি ফেরার পর মার খাবার ভয়ে মেছো ভূতের আছরের ভান করেছে।

দুপুরে বাড়ি ফেরার পর ভেবেছিলাম এক দফা বকাঝকা খেতে হবে। কিন্তু সবাই কেন যেন স্বাভাবিক আচরণ করলো।

ভাত খেতে বসে মামা জানালো, ভাগ্যিস ওই ওঝা মন্ত্র পড়া পানি সেদ্ধ করেছিল, রাগের চোটে মেছো ভূত ওঝাকে গোবরে চুবিয়ে পালিয়েছে জঙ্গলে।

আমি আর আজাদ চোখাচোখি করলাম শুধু। কিছু বললাম না।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে আমরা খেলাধুলা শেষ করে মুখ ধুতে গেলাম বাড়ির পেছনের পুকুরে। ছোট্ট পুকুরটার পাশে একটা খাদমতো, পাটিপাতার ঝোপে ঢাকা পুকুরপাড়। তার ওইপাশে কবরস্থান। পুকুরে তক্তার এক চিলতে ঘাট। কবরস্থানের দিকে পিঠ দিয়ে বসতে হয় পুকুরঘাটে। সবাই হাতমুখ ধুয়ে চলে গেছে। আমি সবার শেষে নেমেছি। ঘাটে বসে পানিতে হাত ডুবিয়ে খেলছি কাদা নিয়ে। গ্রামে এলে পুকুরের কাদামাটি নিয়ে খেলতে ভালো লাগে। অবাধ স্বাধীনতা এখানে। কেউ নেই আশেপাশে। অন্ধকার নেমে গেলেও অদূরে নানার ঘরটা এখনো আবছা দেখা যাচ্ছে। এই পুকুরটা বাড়ির সবচেয়ে কাছে বলে রাতেও এখানে আসে বাড়ির মেয়েরা চাল ডাল ধুতে। ভয়ের কিছু নেই। কাল রাতের মেছো ভূতের কথা মনে হলে হাসি পেল। ওরা কেউ জানে না আসলে ভূতপ্রেত বলতে কিছু নেই। ওঝা যে কত মিথ্যে বলেছে সেটা আমি জানি, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না। শেষবারের মতো কাদা নেবার জন্য ঝুঁকেছি, এমন সময় পেছন থেকে ঠাণ্ডা একটা হাত আমার কাঁধের উপর। পেছনে ঘুরে তাকানোর আগেই ঠাণ্ডা হাতটা ধাক্কা দিল আমার পিঠে। এত জোর ধাক্কা ছিল যে সোজা পুকুরের মাঝে উড়ে গেলাম। ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি, চিৎকার করতে পারছি না, সাঁতারও জানি না। তারপর সব অন্ধকার। জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরলে দেখি আমার শিয়রে একটা কুপি জ্বলছে। আমি পাটিতে একটা কাঁথা গায়ে শুয়ে আছি। শীত লাগছে খুব। আমার চারপাশ ঘিরে আছে অনেকগুলো কৌতূহলী মুখ। মেজো মামা ওঝা ডাকতে যাবে কি না জিজ্ঞেস করছে মামীকে। ওঝা? আবারো? ওদের ধারণা আজাদকে ছেড়ে মেছো ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছে। ভূত ছাড়ানোর সময় আমি আজাদের সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, সেখানেই শরীর অদলবদল করেছে ভূতটা।

এসব কথা শুনে আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। মেছো ভূতের ভয়ে নাকি তরমুজ দাঁতের ওঝার ভয়ে বুঝতে পারলাম না। তবে ধাক্কাটা যে একটা ঠাণ্ডা হাত দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সেই সব ভূতেরা!

নির্জন স্বাক্ষর
ashrafbd7@gmail.com

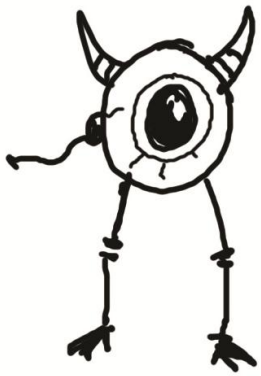

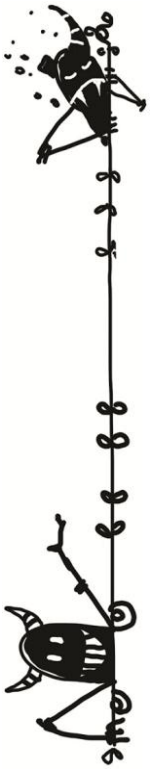

ভূত শব্দটাই কেমন ভূত ভূত। ভূত আছে কি নেই, সেটা নিয়ে তর্ক হতে পারে কিন্তু ভূতের একটা ভয় যে আছে, এটা সত্যি। এই ভয়টার কোনো একটা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। মানুষ একদম সেধে সেধে এই ভয় পাওয়ার জন্য বসে থাকে। আসলে ভূতের ভয় একদম প্রেমের মতন মোহময়। আমরা "এসো আমার ঘরে এসো" গাইতে গাইতে দাওয়াত দিয়ে তাকে নিয়ে আসি। তাই শখ করে ভয়ংকর সব ভূতের গল্প পড়ি অথবা হরর মুভি দেখতে দেখতে মৃগী রোগীর মতন কাঁপাকাঁপি করি। তাতে এক ধরনের মজা পাওয়া যায় সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভূত নিয়ে গল্পের শেষ নাই। বৃষ্টির দিনে সন্ধ্যায় বা রাতে শহরে লোডশেডিং হলে অন্ধকার রুমে বা মোমবাতির আলোয় মুড়িমাখা চাবাতে চাবাতে ভূত নিয়ে গল্পের আড্ডাটা একেবারেই অন্যরকম। একেকজন গল্প বলে আর একেকবার বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে ভূত বা ভূতের ভয় সবার মনে একেকবার উঁকি দেয়। ঠাঠা রোদে দাঁড়িয়ে এইসব গল্প শুনলে হাসি পাবে কিন্তু পরিবেশটাই এখানে বড় একটা ব্যাপার। অন্ধকারে ভূতের গল্প শুনলে আর যাই হোক একটা গা ছমছমে অনুভূতি হবেই।

শহরে ভূতেরা খুব ঝামেলায় থাকে মনে হয়। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটার পর একটা বিল্ডিংয়ের মাঝে চিপাচাপা খুব কম। সেখানে মানুষগুলোই একেকজন ভূতের মতো হয়ে গেছে, ভূত এসে আর আলাদা করে ভয় দেখানোর কথা চিন্তা করে না বোধ হয়। আর চিন্তা করলেই কী? মানুষগুলোই এক একজন ভূতের বাপ! ভূতেরা আসলে ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আমার ভূত বা ভূতের ভয় নিয়ে অভিজ্ঞতা শহরে তেমন নেই, যা আছে সব গ্রামে। ছোটবেলায় শুনতাম দাদুবাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়ে নাকি একটা মেয়ে ভূত থাকে। রাতবিরাতে সে সাদা শাড়ি পরে বরই গাছের উপর বসে সাদা আঁচল ঝুলিয়ে রাখতো। যারা দেখেছে তারা নাকি সেই মেয়ের নাকি- গলায় হিহ- হিহ- হি হাসি শুনেছে। খুব দরকার না হলে দিনের বেলাতেই কেউ যেতো না সেখানে আর সন্ধ্যার পর তো প্রশ্নই আসে না। সেই ছোটবেলার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু দেখি নি। বাঁশঝাড় আর জংলা জায়গায় পাতার খসখসানি শব্দ আর বাতাসের সাথে গাছপালার নড়াচড়ার একটা অদ্ভুত শব্দ আছে যা সেই অন্ধকারে একটু একটু ভয় লাগতে থাকে।

ক্ষেতের দুপাশে গ্রামের রাস্তা দিয়ে রাতে যাওয়ার সময়ে মানুষজন ভয় পেত। মাঝে মাঝেই ইয়া বিশাল একেকটা সাদা আলখাল্লা পরা কী জানি দেখা যেত। ভূতরা নাকি নানান রূপ ধরতে পারে। রাতে দেখা যেত মানুষজনের সাথে একটা কুকুর আসছে রাস্তা দিয়ে, একটু পর সেটা নাকি হয়ে যেত একটা গরু, তারপর একটা ছাগল। ছিল রুমাল, হয়ে গেলো বেড়াল টাইপ আর কি। এটা বেশি হতো একা মানুষের সাথে। এই ধরনের ভূতরা নাকি মানুষের রূপও ধরতে পারে। এদের চেনার উপায় আছে। পা থাকবে উলটো হয়ে আর অনেক সময়ে পা মাটি ছোঁয় না। আরেক ধরনের ভূত আছে যারা মানুষকে একই জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরায়। যাকে ঘোরাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না সে একই

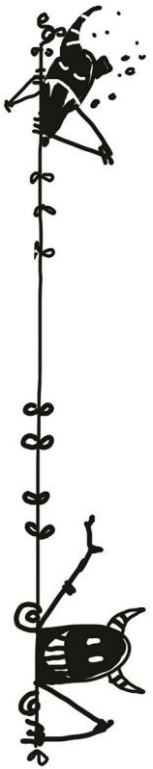

জায়গায় ঘুরেফিরে আসছে। তার কাছে মনে হয় এই তো সামনে রাস্তা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু রাস্তা আর শেষ হয় না। আমার ধারণা আমাকে এই ভূত দিনেদুপুরে মাঝে মাঝে এই শহরে ধরে বসে। তখন আমি এলোমেলো হয়ে ঘুরি।

জঙ্গল বা জংলা জায়গা আমার ছোটবেলা থেকেই পছন্দ। দাদুবাড়ির সামনে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে আমবাগান, কলাবাগান, আরও কিছু ফলের বাগান ছিল। পুরো জায়গাটা বেশ জংলা। ওপাশে পুকুর। সেই পুকুর নিয়েও অনেক কাহিনি আছে। আমরা ফুপাতো ভাই, চাচাতো ভাই, পাড়াতো ভাই, আতালে-পাতালে আত্মীয় আবার এমনি এমনি ভাইরা বিশাল একটা দল ছিলাম। সবাই মিলে শীতের রাতে নানানরকম প্ল্যান করতাম। একবার সবার মনের হাউশ হইলো যে বাগানে বা জংলা জায়গায় একটা ঘরের মতন বানানো তারপর সেখানে রাতে সবাই ভূত দেখার চেষ্টা করবো। দুপুর থেকেই ঘরের কাজ শুরু করে দিলাম। আগেকার দিনের খাটের মশারির স্ট্যান্ডের মতন চিকন কাঠ এনে চারকোনা করে বসানো হলো। তার চারপাশে আলুর খালি বস্তা বা ছালা দিয়ে ঢেকে দিলাম। উপরে পাটখড়ির বেড়ার মতন বসানো হলো।

সন্ধ্যার পর শুরু হলো কিচ্ছার আসর। সবাই গোল হয়ে গুটিসুটি মেরে বসলাম একজন আরেকজনের গায়ে গায়ে লেগে। প্রচণ্ড শীত আর বাতাসে মাঝখানে রাখা কুপির আলো কাঁপতে লাগলো আর সেই আলোয় আমাদের ছায়াগুলো বেদম নৃত্য আরম্ভ করলো। পাশের ক্ষেত থেকে আলু তুলে এনে মাটির চুলায় আগেই পুড়িয়ে আনা হয়েছে। সেই আলুপোড়া খেতে খেতে সেই পরিবেশে যেই গল্পই শুনতাম, একেবারে আত্মা কেঁপে উঠত। এমন এক সময়ে কী একটা গল্প বেশ জমে গেছে, আমরা সবাই একদম দিনদুনিয়া ভুলে গল্পটা গিলছি, ঠিক সেই সময়ে সেই ছালার ঘরে ছালা সরিয়ে একটা মুখ ঢুকিয়ে বলল, এইহানে কী করোছ তোরা? মুখটা একটা মানুষের মতোই, কুপির আলোয়ে যেটুকু বোঝা যায়, পাটের আঁশের মতন চুল ছড়িয়ে ছিল, চোখ দেখে মনে হয় জ্বলজ্বল করছে, ভাঙা গাল, মুখে অনেক কাটা দাগের মতন আর দাঁত পুরো লাল, একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় মুখের ভেতরটাও লাল, ঠোঁটের কোনা দিয়ে লাল লাল কী যেন পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবেশে হঠাৎ করে সেই মুখ দেখে সবাই অসম্ভব ভয় পেয়ে যাই আর তারপর যে যেদিকে পেরেছে... দৌড়! পরে দেখা গেল সেটা ছিল পাশের পাড়ার বুড়ি, যে সারাক্ষণ পান চিবাতো।

সবাই মিলে ভয় দেখানো ছিল আরেকটা মজার খেলা। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা ছিল তাকেই ভূত বানাতাম। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওর দুই হাত উপরে তুলে পিটি করার মতন একসাথে রাখতাম। উপরে তুলে রাখা দুই হাতের উপর মাটির হাঁড়ি বসিয়ে দিতাম। সেটা হতো মাথা। এভাবে করলে একটা মানুষের উচ্চতা যত হবে তার চেয়ে এক ফিটের মতন উচ্চতা বেড়ে যেত। তারপর পুরো শরীর সাদা শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে উপরে দুই হাতের সাথে হাঁড়িটায় ঘোমটা দিয়ে সাজাতাম। এরপর কোনো একটা রাস্তার পাশে জংলা জায়গার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতো। কেউ রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় হুট করে ভূত একদম মানুষের গায়ের উপর ঝুঁকে পড়তো। হুট করে সাদা কিছু একটা অন্ধকারে এভাবে দেখলে ভয় পাওয়ার কথা, ভয় অনেকেই পেত কিন্তু একবার এক বড় ভাই ঝুঁকে পড়ার সময়ে ভূতটাকে মানে আমাদের সেই বন্ধুকে চেপে ধরে। তারপর... যে যেদিকে পেরেছে... দৌড়।

মাঝে মাঝে আবছা মনে পড়ে একটা রাতের কথা, আমি দাদুর সাথে ঘুমাবো, তাই দাদুর ঘরে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনছিলাম। দুনিয়ার কতরকম গল্প যে জানে দাদু। সেদিন হচ্ছিল ভূতের গল্প। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া, খাটের পাশে রাখা হারিকেন নিভে যাওয়া, খটখট শব্দে জানলার কপাট প্রায় ভেঙে যাওয়া, যেন কেউ অপর পাশ থেকে খুব জোরে ঠেলছে। সেই সাথে ক্রমাগত বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, টিনের ঘরের দেয়াল দুলছে। আমি ভাবছিলাম গল্পের ভূত চলে এসেছে। একটু পর টিনের চালে ঝুম বৃষ্টির শব্দ, দাদু হাত বাড়িয়ে আমা কে ধরে বলছিল, "ভয় পাইসোছ? ঝড় আইছে।" আমি সেই হাত সব শক্তি

দিয়ে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করেছিলাম আর ভাবছিলাম সময়টা যেন দ্রুত চলে যায়। আমার ধারণা আমি ঐদিনের মতো ভয় আর কোনোদিন পাই নি।

জীবনে নাকি অনেক কিছু ঠেকে শিখতে হয়। যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, তখন অনেক বড় একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছিলাম। সে সময়ে আমরা ঢাকায় থাকি আর প্রতি উইকেন্ডে বাড়ি যাই। রাতের বেলা সেজো চাচার সাথে ঘুমাচ্ছি। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের এক কোনায় হারিকেন জ্বালানো থাকতো অল্প করে, অনেকটা ডিম লাইটের মতো। আমি সেই আলোয়ে ঘড়িতে দেখি প্রায় আড়াইটা বাজে। আমার ধরেছে বাথরুম, একেবারে বড়টা। সমস্যা হচ্ছে ছোটটা ধরলে ঘরের বাইরে গিয়ে ঘরের পেছনেই কাজ সারা যায় কিন্তু বড়টার জন্য আমাকে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির একেবারে পেছনের অংশে যেখানে বাঁশঝাড় আছে তার নিচে বাথরুমে যেতে হবে। আগেকার দিনে বাথরুমগুলো হতো মূল বাড়ির পিছনে একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায়। যাই হোক, সেটাও সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে এত রাতে বাইরে গিয়ে এতদূর যাবো তাও ভয়ঙ্কর জায়গায় যেখানে সব ভূত থাকে।

আমি চাচাকে ডাকি। কিন্তু এই চাচার ঘুম এমন যে আস্ত বাড়ি ভেঙে তার উপর পড়লেও সে টের পাবে না। একদিকে ভূতের ভয়, আরেকদিকে বাথরুমের চাপ, কী করি কী করি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম বাথরুমের সামনে। সেই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পরে কখন যে বিপুল বেগে দৌড়ে এখানে চলে এসেছি নিজেই জানি না! তখন আমার ভূতের ভয় নাই। কোনো ভয় নাই। মাথায় চিন্তা কতক্ষণে হালকা হবো। ধুর, ভূত আবার একটা ভয় পাওয়ার জিনিস নাকি? যেই হালকা হলাম সাথে সাথেই আবার ভুতের ভয়। যতরকমের ভূতের গল্প শুনেছি সব মনে পড়ে গেল। আবার ঘরে এতদূর কীভাবে ফিরে যাবো সেই চিন্তায় অস্থির। কোনোমতে ঘরে ফিরে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুম। সেই রাতে যা বুঝলাম, মাঝে মাঝে ভূতের ভয়ের চেয়েও বড় ভয় হাজির হয়।

এতক্ষণ যা বকবক করলাম, সেই জায়গা মানে আমার দাদুবাড়িতে গত বর্ষায় দলবল নিয়ে গিয়েছিলাম। সারাদিন রাত নৌকায় ঘোরাঘুরি, জোয়ারের পানিতে নেমে চুবানি খাওয়া, ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। ছোটবেলার সেই জংলা জায়গা এখন নেই, তবে গাছপালা দিয়ে ঘেরা বাড়ি। বাড়ির সামনে পুকুরপাড়ের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তার বদলে ইট বিছানো রাস্তা। রাতের খাবারের পর আমরা সবাই পুকুরপাড়ের সামনে আড্ডা মারছিলাম। কী মনে হলো, সবার মাথাতেই ছবি তোলার ভূত চাপলো এবং সেটা হতে হবে ভৌতিক ছবি। একেকজনের মাথায় একেকরকম ভূতমার্কা আইডিয়া আর কম্পোজিশনে ভর্তি। এত আইডিয়া মাথায় ভূতের মতন ভর করে মাথা চুলকাতে লাগলো। তাই সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

আমি ভাবছিলাম ছোটবেলায় এই রাস্তাটা নিয়ে একগাদা ভূতের গল্প শুনেছি, তাই এখানেই একটা ভূতমার্কা ছবি তুলবো। কম্পোজিশন কেমন হবে সেটা বাকি ৩ জনকে বুঝিয়ে বললাম। পুরো ছবিটা তুলতে গেলে আসলে ৪ জনেরই অংশ নিতে হবে। তখন মনে হয় অমাবস্যা ছিল কারণ জায়গাটা একেবারেই আলকাতরা- কালো ছিল। পুরো ছবিতে কীভাবে লাইট আনবো এবং একই সাথে কম্পোজিশনের সবকিছু জায়গামতন রাখা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু সহজ হয়ে গেলো রোয়েনা, সুহাস ভাই এবং আবিরের জন্য।

পুরো ছবিটা ৪ মিনিট ধরে তোলা আমার ক্যামেরা Nikon D90 দিয়ে আর লেন্স ছিল আমার ভাঙা কিট 18-55 mm. এই ৪ মিনিটে রোয়েনা ভূতের মতন বসে ছিল কোনোরকম নড়াচড়া ছাড়াই। আবির গাছভূত হয়ে গাছ খামচে ধরে ছিল পুরোটা সময়। সুহাস ভাই পুরো ছবিটায় টর্চ লাইট দিয়ে লাইটিং করেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনমতো। আমি স্টপ ওয়াচ ধরে ধরে বলছিলাম কতক্ষণ গেলো আর সুহাস ভাইয়ের লাইটিংয়ের সময়ে কোথায় কতক্ষণ লাইট পড়লো সেটা খেয়াল রাখছিলাম। এই ছবিটা আসলে পুরো একটা টিম ওয়ার্ক। নিজের বলতে শুধু কম্পোজিশন আর শাটার বাটন চেপে ধরা নিজের ক্যামেরায়। ৪ মিনিট পর ছবিটা দেখে আবার আরেকটা ছবির জন্য প্রস্তুতি।

যতই বলি আমার ভয়- ডর নাই, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, ছবিটা তোলার সময়ে রোয়েনার এক্সপ্রেশন, আবিরের হাত, সুহাস ভাইয়ের লাইট নিয়ে ছোটাছুটি, অন্ধকার রাত, দূরে শেয়ালের ডাক, এপাশে কুকুরের ঘেউ ঘেউ, পুকুর পাড়ের পাশের গাছের পাতায় বাতাসের সাথে একটা অদ্ভুত সরসর শব্দ, সব মিলিয়ে গা বেশ ভালোই ছমছম করছিলো। আর সেই বাতাসের সাথে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছিলাম। একেবারে নির্ভেজাল ভূতের ভয় পাওয়া একেকটা রাতের শৈশবে।

পনেরোই জুন

আনোয়ার সাদাত শিমুল

shimulas@gmail.com

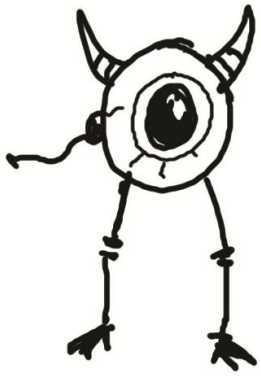

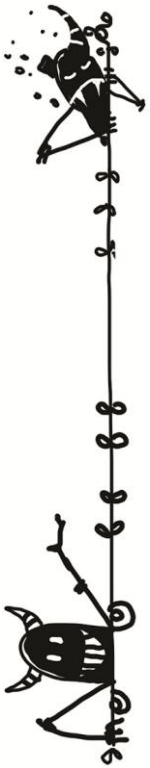

প্রবল বৃষ্টি ছিল সে রাতে।

বিকেল পর্যন্ত আমার ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু, প্রফেসর মেইল করেছে, এ সপ্তাহের মধ্যে প্রপোজালটা ফাইনাল করে পাঠাতে হবে। এবার রিভিউ কমিটিতে তিনি খুব চেষ্টা করবেন যেন আমাকে ফুল ফান্ডিং ও অন্যান্য সুবিধাসহ রিসার্চ অফার দেয়া যায়। গত ছয়মাস প্রতিদিন অল্প অল্প করে প্রপোজালটা লিখেছিলাম। কিন্তু প্রফেসর যখন রিভাইজ করতে বলল, তখন আমার মাথা বিগড়ে গেছে। প্রপোজালটা ফাইনাল করতে টানা চারদিন কাজ করেছি। তাই বৃষ্টির সে রাতে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বের হতে দেরি হয়ে যায়। গেইটের কাছে একটা রিকশা পেতে দরদাম না করেই গুলশান বলে উঠে পড়ি।

যতটুকু মনে পড়ে, আমি রিকশার হুডের ডানপাশ ধরে শক্ত হয়ে বসেছিলাম। ডান পা ঠেসে রেখেছিলাম রিকশার পা-দানিতে। বাম হাতে রিকশার সামনের প্লাস্টিক মেলে রাখার চেষ্টা করছি, রাখা যাচ্ছে না। বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে বারবার। আমার প্যান্ট, স্যান্ডেল ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। রাস্তার লাইটপোস্টের আলোও যথেষ্ট ছিল না। মনে হচ্ছিল, মাঝবয়েসি রিকশাওয়ালা এক পাশবিক শক্তিতে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট পার্ক পার হয়ে রিকশা বামে মোড় নিয়ে ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বেসির দিকে যাবে, ঠিক অমন সময় চোখে তীব্র আলো এসে লাগে। জিপ ছিল নাকি ট্রাক ছিল ওটা? দেখতে পাই নি। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে কী একটা উঠে গেল, আমি উলটে গেলাম রিকশাসহ।

তারপর কী হলো মনে পড়ে না।

শুধু এটুকু মনে পড়ে, এক ক্লান্তিকর ঘুম পার হওয়ার পর যখন আমি জেগে উঠি, তখনো রাত। সাদা দেয়ালের ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, দেয়ালে আছে তৈলচিত্র - তার ওপরে রঙিন স্পট লাইট। টের পাই, এ আমার ঘর নয়। হাসপাতালও নয়। কোথায় এলাম, কীভাবে এলাম?

পাশে ফিরতেই দেখি চেয়ারে বসা এক মহিলা, নাকি তরুণী - আমি বুঝতে পারি না। আধো আলো আধো অন্ধকারে এটুকু নিশ্চিত হই, মানুষটি আম্মা নয়, বড় আপা নয়, সেতারা খালা নয়, রুমা কিংবা সোমাও নয়। তাহলে কে সে?

আমার মাথার পাশ ফেরানো, শরীর নড়াচড়া দেখে তিনি উঠে আসেন। আমার কপালে হাত রাখেন। অচেনা এ মহিলাকে কিছুটা চেনা চেনা লাগে। কোথায় দেখেছি তাকে? মনে হয় তিনি বিটিভির ঘোষিকা, নাকি সংবাদ পাঠিকা? আমার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। টের পাই, তখনো আমার শরীর ভেজা। প্যান্ট লেপটে আছে দু'পায়ে। কোমরে ভর দিয়ে আমি উঠে বসার চেষ্টা করি। পারি না। সমস্ত শরীর ব্যথা করছে।

কাঁপাকাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি, "কে আপনি? আমি এখানে কেন?"

তিনি জবাব দেন না।

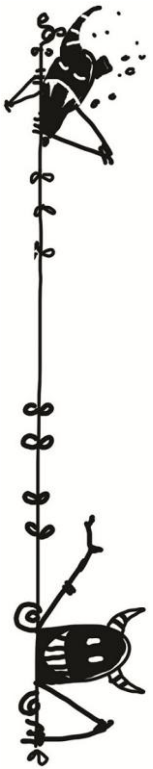

আমার কপালে রাখা হাত এবার চুলে বিলির মতো করে কেটে নেন। ঠাণ্ডা কপালে উষ্ণতা টের পাই। মারাত্মক শীতল কণ্ঠে তিনি বলেন, "তুমি অসুস্থ, ক্লান্ত। শুয়ে থাকো।"

আমার ভেজা শরীরে এবার কাঁপুনি দেয়। এ কণ্ঠ এমন কেন? মানুষের কণ্ঠ? নাকি দূর থেকে ভেসে আসা কোনো এক শব্দ!

"কিছু খাবে?" চেয়ারে ফিরে গিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন।

আমার গলা জড়িয়ে আসছে। আমি কথা বলতে পারছি না। কিন্তু টের পাচ্ছি, এ কণ্ঠ স্বাভাবিক মানুষের কণ্ঠ নয়। "কিছু খাবে" এ শব্দ দুটো যেন কাচের বোতলভর্তি মানুষের আওয়াজ। অস্পষ্ট, বিপদাপন্ন, শঙ্কিত মানুষের গলা। রহস্যময়।

আমি কিছু বলি না। পাশ ফিরে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। চেহারাটা কোথায় দেখেছি ভাবার চেষ্টা করি, বিটিভির সংবাদ পাঠিকা কিংবা ঘোষিকা নয়, মনে হয় তাকে কোনো বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডে দেখেছি। চা পাতার বিজ্ঞাপন, নাকি জন্মবিরতিকরণ পিলের বিজ্ঞাপন? শেষটাই সঠিক মনে হয়। কোথায় ছিল বিলবোর্ডটি? মহাখালী রেলক্রসিংয়ের মোড়ে, নাকি সাত মসজিদ রোডে?

চেয়ার থেকে উঠে এসে এবার তিনি রুমের বাতি জ্বালিয়ে দেন। পুরো ঘর আলোয় ভরে ওঠে। আমার চোখে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। যেন এক জগত থেকে অন্য জগতে চলে যাচ্ছি আমি। রূপান্তর ঘটছে। যাকে এতক্ষণ আমি সেতারা খালার বয়সি মহিলা ভাবছি, তিনি আসলে আরও তরুণী? কত বয়স? চব্বিশ অথবা ছাব্বিশ। মুখে প্রগাঢ় মেক- আপ। হাল্কা পারফিউমের ঘ্রাণ। খোলা চুল। হাতে চুড়ি। বেগুনি সিল্কের শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে তিনি আমাকে বলেন, "আমাকে তুমি বিলবোর্ডে দেখো নি।"

আমার সমস্ত শরীর এবার অবশ হয়ে ওঠে। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরলে যেমন হয়, কোমরের পর থেকে তেমন হচ্ছে। আমি কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় দেখেছি আপনাকে?"

এরপর বিড়বিড় করে বলি, "আপনি কে? আমি এখানে কেন? কীভাবে এলাম এখানে?"

তিনি এবার আমার পায়ের কাছে বিছানায় এসে বসেন। এক পা বিছানায় তুলে হাঁটুতে থুতনি রাখেন। চোখ আমার দিকে। খুব সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "আমি আজ রাতের জন্য তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"কীভাবে আনলেন? কেন আনলেন?"

"গল্প করবো।"

আমি থতমত খাই। টের পাই, অনেক কিছু আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আমি এখানে বন্দি হয়ে গেছি।

তিনি বলে চলেছেন, "জিপের ড্রাইভারকে মেরে ফেলেছি বনানীতে। তারপর একটানে গুলশান লেকের পাশ দিয়ে আসতেই সামনে তোমার রিকশা। রিকশাওয়ালাকে মারার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাঁচাতে পারি নি। তুমি বেঁচে আছো।"

আমি এবার নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করি। আমার শরীরটা নাড়ানোর চেষ্টা করি। আমি জানি আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। একটু নড়াচড়া করলেই ঘুম ভেঙে যাবে, দেখবো - আমি মিরপুরে আমার বিছানায় শুয়ে আছি। তাই ভয় খানিকটা কেটে যায়। আবার জিজ্ঞেস করি, "আপনি কে? কোথায় দেখেছি আপনাকে?"

তিনি হাসেন। বলেন, "আমার কোনো নাম নেই। আজ যেমন আমার নাম এখানে লায়লা। আগামীকাল রাস্তার ওপাশে গেলে আমি হয়ে যাব জুলি। আবার

এখানে ফিরে এসে পরের রাস্তায় গেলে আমার নাম হবে সুমি, অন্য কোথাও অন্য কোনো নামে...”

আমি আবার পুরোনো প্রশ্নে যাই, নিজের সঙ্গে নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধির পরীক্ষা করি। জিজ্ঞেস করি, “লায়লা, এখানে মানে কোথায়, আমরা?”

লায়লা তার মুখের কাছে ঝুলে পড়া চুল সরিয়ে বলেন, “এখানে মানে সৌদি অ্যাম্বেসি। আমি এখানে লায়লা। অ্যামেরিকান অ্যাম্বেসিতে আমি জুলি, জাপানেরটায় সুমি।”

আমার সারা শরীরে আবার ঝলক লেগে ওঠে।

“আমি সৌদি অ্যাম্বেসিতে? কী করে ঢুকলাম? আপনি এলেন কী করে?”

“আমি তো আসতাম আগে। এখনো আসি। আমি গল্প করি। গান করি। মানুষের নিঃসঙ্গতা দূর করি।”

শেষ কথাটি বলে লায়লা খিলখিল করে হেসে ওঠেন। এ হাসির শব্দ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। একবার দুবার তিনবার করে অনেকবার।

আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বলেন, “তোমাকে ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বেসি ভিসা দেয় নি বলে মন খারাপ? যাবে, ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বেসির ভেতরে যাবে আজ রাতে, এরকম এক ঘরে?”

এবার আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই।

স্বপ্ন বাস্তবের মাঝামাঝি দেয়াল ভাঙার যে কৌশলে আমি মেতেছিলাম, সেখানে আমি হেরে যাচ্ছি। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, এ স্বপ্ন হোক, আমার ঘুম ভাঙুক। কিন্তু টের পাচ্ছি, স্বপ্ন নয়, আমি বাস্তবে কথা বলছি।

লায়লা আমাকে আবারও প্রস্তাব দেন, “চলো ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বেসিতে যাই, কেউ আটকাবে না, শুধু গেইটের দারোয়ানকে বলবো, আমি জুলি। দেখবে সব দরজা খোলা। চলো, তোমাকে আজ কুইবেক হুইস্কি খাওয়াবো। আমি পান করি। নাচ করি। আমি গল্প করি। গান করি। মানুষের নিঃসঙ্গতা দূর করি।”

আমার ভয় আরও বেড়ে যায়, কান্নাকাতর কণ্ঠে আবারও বলি, “প্লিজ। আমাকে নিয়ে এ খেলা খেলবেন না, প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন।”

ভেতরে ভেতরে আমার এও মনে পড়ে, হুমায়ূন আহমেদের কোনো এক উপন্যাসে এরকম এক নায়িকা ছিল। বিভিন্ন নামে বিভিন্নজনের সঙ্গে শোয়। কিন্তু গল্পের মানুষ যখন বাস্তবে এসে আমাকে আঘাত করে, রহস্যের জাল পেতে খেলা করে, তখন আমি অসহায় হয়ে যাই।

আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করি। পারি না। লায়লা এবার আমার দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন, বলেন, “ঠিক তোমার মতোই ছিল, ঠিক তোমার মতো কোঁকড়া চুলের মানুষ সে। তোমার মতোই লম্বা। তোমার মতো করেই তাকাত।”

আমি জিজ্ঞেস করি, “কে? কার কথা বলছেন?”

লায়লা বলে চলেছে, “ঠিক আজকের এই তারিখেই, পনেরো জুন। আজ রাতেই, আমি মারা গিয়েছিলাম, খুন হয়েছিলাম।”

শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। “কী?” বলে জোরে চিৎকার করে উঠি। টের পাই, আমার বুকের ভেতরের কলজে উলটে গেছে, সেখানে শক্ত আর কিছু নেই, সব গলে পানি হয়ে গেছে।

লায়লা আমার বুকে হাত রাখে। বিদ্রূপ হাসিতে হেঁয়ালি করে গান গায়, “এই রাত তোমার আমার, শুধু দুজনের।”

আমি বরফের মতো শীতল ও শক্ত হয়ে যাই।

লায়লা আমার বুকে তার দুহাত আর মাথা রেখে চেপে ধরে। বলে, “নাচ হবে গান হবে, অনেক কিছু হবে আজ। আজ পনেরোই জুন। আমি নাচবো আজ। অনেক নাচবো, গাইবো। কিন্তু প্লিজ, দোহাই খোদার, বুকে লাথি দিও না।”

আমি আগের মতো বরফ, স্থির।

"দেখো, এই যে এখানে", বুকের আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের নিচের হুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে লায়লা বলে, "এখানে লাথি মেরেছিল। লোকটা ঠিক তোমার মতোই ছিল, ঠিক তোমার মতো কোঁকড়া চুলের মানুষ সে। তোমার মতোই লম্বা। তোমার মতো করেই তাকাত।"

লায়লা আমার কপালে চুমু দেয়। আমি টের পাই, এর নাম ডেথ কিস। এরপর আমি মারা যাবো। তাই চোখ দুটো বন্ধ করে রাখি।

দুহাতে চুলের দুদিকে ধরে লায়লা আমাকে তোলার চেষ্টা করছে, বলেছে, "ওঠো, এসো, গল্প করি, নাচ করি, তুমি যা চাও আমি তা- ই হবো, লায়লা, জুলি, সুমি অথবা অন্য কেউ।"

আমি পাথরের মতো পড়ে থাকি।

লায়লা চুমুতে চুমুতে আমার কপাল ভরিয়ে দেয়। তারপর আচমকা চড় মেরে বসে গালে। চিৎকার করে বলতে থাকে, "হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা, শুওরের বাচ্চা; লাথি মারলি ক্যান? বল, লাথি মারলি ক্যান? কী দোষ ছিল আমার বল? নাচি নাই, গাই নাই? কোমর দুলাই নাই? তাহলে লাথি মারলি ক্যান? খুন করলি ক্যান?"

আমি কোনো সাড়া দেই না। কারণ, জানি আমি মরে যাচ্ছি।

লায়লা আমার বুকে ঘুষি মারতে থাকে, বলে, "ওঠ্! রাত শেষ হলেই আমি চলে যাবো, আবার ফিরে আসবো আরেক পনেরো জুনে। দেরি হয়ে যাবে অনেক, ওঠ্! আয় গল্প করি, গান করি, নাচ করি।"

মৃত্যুর জন্য বন্ধ করা চোখে ভর রেখে আমি টের পাই লায়লা ক্লান্ত হয়ে গেছে। ফোঁসফোঁস শব্দে কাঁদছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে, "আমি গ- ল্প করি। গা- ন করি। মানুষের নিঃসঙ্গতা দূ- র করি।"

স্বপ্ন এবং বাস্তবের বেড়াজাল থেকে বেরুতে আমি তৎপর হয়ে উঠি। আরেকবার বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার শরীরে শক্তি দেয়। উঠে বসে এক ঝটকায় লায়লার চুল মুঠো করে ধরি। আচমকা এমন আচরণে লায়লাও পালটা আঘাতের চেষ্টা করে। কিন্তু, আমি শক্ত করে তার চুল ধরে ফেলেছি। চেষ্টা করছি মেঝে ফেলে তাকে লাথি মেরে শুইয়ে দেয়ার। অথচ আমাকে অবাক করে দিয়ে, আমার এ চেষ্টাকে বৃথা করে দিয়ে, লায়লা অনেকটা শূন্যে দু- তিনবার চক্কর খায়। উড়ন্ত পাখির মতো দুম করে লাথি মারে আমার কোমরে। তখনো আমার মুঠিতে লায়লার চুল ধরা ছিল। কোমরে কেমন ব্যথা পেলাম জানি না, তার আগে টের পেলাম আমার হাতের তালুতে গেঁথে গেছে লায়লার চুলের ক্লিপ। আরেকবার জ্ঞান হারানোর আগে তালুর ঐ ব্যথাটাই তীব্র হয়ে উঠলো।

চোখ মেলতেই টের পাই আমি মাটিতে শুয়ে আছি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোর হয়ে আসছে। উঠে বসে দেখি গুলশান লেকের পাশে, ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বেসি থেকে ২৫/৩০ ফুট দূরে আছি। মাথাটা কেমন যেন হালকা লাগে। আশেপাশের অবস্থা দেখে বুঝতে পারি রাতে তীব্র ঝড় বয়ে গেছে। পাঁচ সাতটা বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে এখানে ওখানে। আমি উঠে দাঁড়াই। শরীরে তীব্র ব্যথা। হনহন করে হাঁটতে থাকি গুলশান দুই নম্বর মোড়ের দিকে। গত রাতে কী হয়েছিল, আমি কোথায় ছিলাম; কিচ্ছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আমি বেঁচে আছি। আমি মরি নি। আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবো; এ আনন্দে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। আরও জোরে হেঁটে ডোরিন টাওয়ারের পেছনে গেলে দেখি মিরপুরগামী গ্রামীণ পরিবহনের কোনো গাড়ি নেই। রাস্তার ওপাশে সাবেরা টাওয়ারের নিচে এক সিএনজিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। দেড়শ টাকা চাইতেই রাজি হলাম। বিশ মিনিটে বাসায় পৌঁছে গেলাম। আম্মা আব্বা গ্রামে গেছেন। বাসার কাজের ছেলে রুস্তম দরজা খুলে দিলে আমি রুমে ঢুকে জামাকাপড় বদলে আবার শুয়ে পড়ি। ভয়ানক ক্লান্তি, চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমের লক্ষণ নেই। অদ্ভুত একটা ভয় চারপাশে ঘিরে রেখেছে। রুস্তমকে ডেকে বললাম, "আমি ঘুমাবো, তুই ফ্লোরে বসে থাকবি, কেউ আসলে দরজা খুলবি না, খবরদার!"

রুস্তম আমার কথা বোঝে কি না জানি না। শুনতে পাই সে বলে, "কই ছিলেন সারা রাত? আমি ভয় পাইছি খুব। কী তুফানটাই হইলো।"

আমি কিছু বলি না। গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকবার মনে হয়, জ্ঞান হারালাম। রুস্তম সম্ভবত আমার মাথায় ঠাণ্ডা পানিও ঢালল।

টানা দুইদিন জ্বরে ভুগে সেরে উঠলে পনেরোই জুন রাতের কথা ভাবি।

ফোন করে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হাসানকে বাসায় আসতে বলি। ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক, অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হাসান আমার সব ঘটনা শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, "পুরোটাই বানোয়াট।" প্রথম কারণ, সে রাতে আমি রিকশা করে প্রেসিডেন্ট পার্ক পার হয়ে গুলশান আসছিলাম। অথচ, দূতাবাস এলাকার ঐ অংশে রিকশা চলে না।

আমি উলটা যুক্তি দেখাই, "সে রাতে বৃষ্টি ছিল। তাই রিকশাওয়ালা ঢুকতে পেরেছে।"

হাসান জিজ্ঞেস করে, রিকশা নদ্দা বাজার না হয়ে ঐ উলটা পথে ঘুরতে গেল কেন? আমি কেন রিকশাওয়ালাকে ভুল পথে যাওয়ায় বাধা দিলাম না?

আমি বলি, আমার মনে নেই কেন বাধা দিলাম না। প্রবল বৃষ্টিতে আমি ভিজে যাচ্ছিলাম, দ্রুত ঘরে ফিরতে চাচ্ছিলাম, সেটাই হয়ত কারণ।

কিন্তু হাসান আমার যুক্তিকে তুচ্ছ করে দেয়।

হাসান তার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার কাছে রাখে, "লায়লা বলেছে, তোর রিকশাওয়ালাকে মেরে ফেলেছে সে। তাহলে সকালে ঐ জায়গায় তুই কোনো লাশ দেখেছিস? কিংবা কোনো দুমড়ে যাওয়া রিকশা?"

আমি বলি, সকালে আমার অতকিছু খেয়াল ছিল না। কিন্তু আমার বালিশের নিচ থেকে ষোলোই জুনের দৈনিক সমকাল পত্রিকাটি খুলে হাসানের সামনে মেলে ধরি। প্রথম পাতায় তিন কলামের খবর - "রাজধানীতে প্রবল ঝড়, নিহত ৬ আহত অর্ধশতাধিক।" খবরের ভেতরের অংশ থেকে পড়ে শোনাই, "গুলশান লেকের পাশে তীব্র বাতাসে ভেঙে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে এক রিকশাওয়ালা নিহত হয়েছে।"

হাসান এবার হাসে। বলে, "হলো না। লায়লা বলেছে, তার গাড়ির চাপায় রিকশাওয়ালা মারা গেছে। তাহলে তো সেরকম রক্তাক্ত থেঁতলে যাওয়া লাশের খবরই আসতো।"

আমি বলি, "ওটা লায়লার কারসাজি। রিকশাওয়ালাকে মারলেও আমাকে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার কতটুকু দূরত্বেই বা রিকশাওয়ালা ছিল?"

হাসান মেনে নেয় না। এবার হাসানকে দৈনিক সমকালেরই ভেতরের পাতায় ছোট্ট বক্স নিউজ দেখাই - "বনানীতে ড্রাইভারকে শ্বাসরোধ করে খুন গাড়ি ছিনতাই।" জিজ্ঞেস করি, এটা কি লায়লা বলে নি আমাকে?

হাসান হো হো শব্দে হাসে। বলে, "ধুররো, তোর মাথা পুরা শেষ। এখন পত্রিকায় যত খবর পড়বি, সবটাই তোর কাছে মনে হবে লায়লার কারসাজি।"

আমি কষ্ট পাই।

আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটি আমাকে এমন অবিশ্বাস করবে ভাবি নি। এবার ডান হাতের তালু হাসানের চোখের সামনে মেলে ধরি, "এই দ্যাখ। ক্ষত দেখিস? শুকানো রক্ত দেখিস?"

হাসান বলে, "হুঁ দেখি তো। তো? শোন, সে রাতে তোর রিকশার ওপরে গাছ ভেঙে পড়েছিল। তুই ছিটকে গেছিস দূরে। পড়ে গেছিস, বেঁচে গেছিস। হাতের তালুতে কিছু একটা গেঁথে গেছে। আর বাদবাকি লায়লা, এর পুরোটাই স্বপ্ন। গাধা।"

আমি এবার বাম হাতে পকেট থেকে একটা চুলের কালো ক্লিপ হাসানের হাতে তুলে দিই। বলি, "দেখ, ক্লিপে কী লেখা আছে।"

"লায়লা।" হাসান বিড়বিড় করে পড়ে সত্যি কিন্তু, আবারও আমাকে পাত্তা দেয় না। বলে, "চল তোকে পুরান ঢাকার প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিগুলায় নিয়ে যাবো। দেখবি, ওরা লায়লা, জুলি, সুমি, পলি, কলি - কতো হাজারো নাম লেখা জিনিস বানায়।"

আমি হাসানের দিকে করুণ চোখে প্রশ্ন ছুড়ি, "তাহলে কি পুরোটাই বানিয়ে বলছি?"

হাসান উঠে দাঁড়ায়। বলে, "শোন, তুই যা বললি, ভুতুড়ে গল্পের জন্যে এটা খুব পপুলার একটা ফরম্যাট। এরকম বিশটা গল্প অন্তত আমি পড়েছি, সিনেমাও দেখেছি সাত আটটা। আর এইমাত্র দেয়ালে ক্যালেন্ডারে দেখলাম, পনেরোই জুন মানে বাংলায় পহেলা আষাঢ়। আষাঢ়ে গল্প হিসেবে তোর এই কাহিনি মন্দ না। লিখে ফেল। রহস্যপত্রিকায় পাঠালে পরের সংখ্যাতেই ছাপিয়ে দেবে। পাঠকের বাহবা পাবি অনেক।"

আমি বলি, "তাহলে এই ক্লিপটা নিয়ে কী বলবি?"

হাসান দুহাতের বুড়ো আঙুলের চাপে ক্লিপটা কটমট করে ভেঙে ফেলে বলে, "ওটার অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। পড়ালেখা করতে করতে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। একটা ব্রেক দরকার তোর। চল, দলবল নিয়ে কক্সবাজার থেকে ঘুরে আসি, অফ- সিজনে খরচ কম পড়বে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি, "আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

হাসান বিদায়ের ভঙ্গি করে বলে, "চল চল - তখন সবাই মিলে তোর এই গাঁজাখুরি গল্পটা আবার শোনা যাবে।"

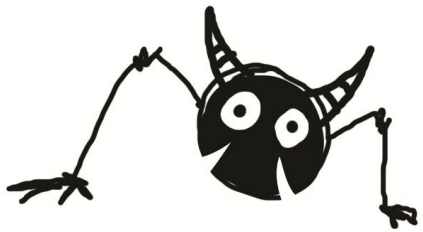

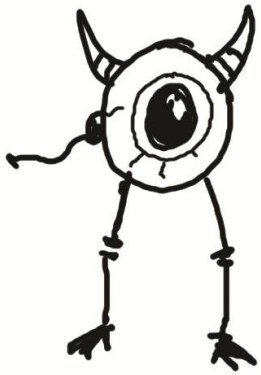

শুক্লপক্ষ

ধুসর গোধূলি
dhushorgodhuli@gmail.com

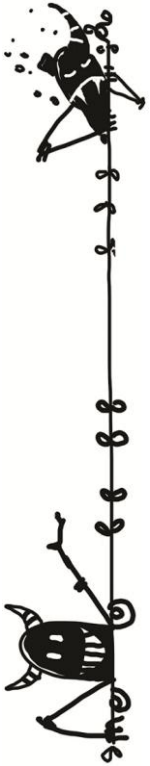

গ্রামের একমাত্র মাটির সড়কের পাশের কালিবাড়ির বটবৃক্ষটা নিয়ে নানা কুকথা, সুকথা, আকথা প্রচলিত ছিল আমাদের এলাকায়। সবচেয়ে প্রবীন ব্যক্তিটিও বটগাছকে তাঁর ছোটবেলায় এমনই দেখেছে, যেমনটা আমরা, সবচেয়ে নবীনরা আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি। গাছটির বিশালাকৃতির কাণ্ড উলম্বভাবে ভাঁজ খেয়ে খেয়ে একেকটা কোটরের জন্ম দিয়েছিল। বিশাল বিশাল সব ডাল থেকে শেকড় গজিয়ে তা মাটি পর্যন্ত ঝুলত। নিশুতি রাতে হাট থেকে ফেরার পথে সেই বটগাছ থেকে অপার্থিব মহিলা কণ্ঠের বিষাদ সুর ভেসে আসতে অনেকেই শুনেছে। সেই সুর কানে এলে পরনের লুঙ্গি খুলে উলটো করে পরে তারপর বাকি পথ পাড়ি দেয়ার ঐতিহ্য চালু ছিল অনেক অনেক আগে থেকেই। তেমনি এক নিশুতি রাতে একা গ্রামের প্রবীন ব্যক্তি আক্রমুদ্দি প্রধান লুঙ্গি উলটো করে পরতে গিয়ে ভয়ের চোটে লুঙ্গি রেখেই দৌড়ে জান নিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারার এক রসালো গল্প আমরা শুনেছিলাম। তাতে সবাই ভয় পেলেও আমার ছেলেবেলার বন্ধু ফরিদ হেসেই খুন হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমরা যেখানে দিনের বেলাতেও কালিবাড়ির বটগাছের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করতাম না, সেখানে ফরিদ স্কুল থেকে ফেরার পথে দৌড়ে গিয়ে বটগাছের ঝুলন্ত শেকড় ধরে প্রায়ই দোল খেতে খেতে আমাদেরকে ডাকতো তার সাথে যোগ দিতে। সাহসে কুলাতো না বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ফরিদের ডাকে সাড়া দিতে পারতাম না আমরা কেউই! ফরিদ আমাদের ভয়ার্ত চেহারা দেখে খিল খিল করে হাসত আর দোল খাওয়ার তীব্রতা বাড়িয়ে দিত।

ফরিদদের বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির তিন বাড়ি পরে। দক্ষিণে। তার দাদাকে আমার ভীষণ ভয় ছিল, কেন জানি! তিনি তাদের বাড়ির বাইরের দিকের একটা ঘরে মুদি দোকান চালাতেন। একটা কটকটিও বেশি দিতেন না। কেউ দুষ্টুমি করে বয়াম থেকে নির্ধারিত সংখ্যক কটকটির চেয়ে একটা কটকটি বেশি তুলতে গেলে তিনি হাতশুদ্ধই বয়ামের মুখে ছিপি চেপে ধরতেন। আর ভয়ানক চোখ করে তাকাতেন। লোকে বলত, ফরিদের দাদা জ্বীন পালতেন। প্রায়ই চান্নি পসর রাতের শেষে তার সাথে দেখা করতে আসতো জ্বীনেরা, গোপনে। কেউ দেখে ফেললে তার আর রক্ষা নেই! জ্বীনেরা তাকে শেষ করে ফেলত। লোকে আরও বলত, ফরিদের দাদী নাকি জ্বীনদের হাতেই মারা গেছেন। তিনি নাকি এক চান্নি পসর রাতে ঘুম ভেঙে স্বামীকে ঘরে না দেখে আর বাহির বাড়ির দোকানঘরে আবছা শব্দ শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন সারা দোকানঘর তীব্র আলোকিত করে কিছু মানুষ তাঁর স্বামীর সাথে কথা বলছে! তিনি মাথায় ঘোমটা টেনে দোকানঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন। তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে তীব্র আলোকিত দোকানঘর মুহূর্তেই কুপির টিমটিমে আলোতে পরিণত হয়েছিল। ফরিদের দাদা কেবল ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ফরিদের দাদীর দিকে, কোনো শব্দ না করে। ঠিক যেমনভাবে বসেছিলেন পরেরদিন স্ত্রীর নিথর দেহের পাশে, একটাও কথা না বলে, এক ফোঁটাও চোখের পানি না ফেলে!

ফরিদের দাদা কখনো ফরিদের দাদীকে নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। ঘরেও থাকতেন না আর। দোকানঘরেই ঘুমাতেন, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

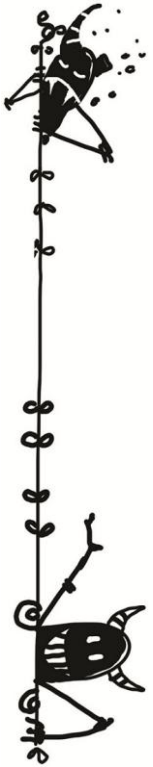

দাদা গম্ভীর হলেও, ফরিদ ছিল খুবই হাসিখুশি, চঞ্চল। ভোরে উঠে কাঁচা সড়কের নিচের বীজতলার ছোট ছোট ধানের চারার মাথায় জমে থাকা শিশিরের ওপর আলতো করে লাঠি ঘুরিয়ে খুব সুন্দর ডিজাইন করতে পারত। মক্তবে যাওয়ার সময় সড়কের উপর থেকে দেখলে সেখানে কখনো মানুষের মুখ, কখনো আমার নাম দেখতে পেতাম স্পষ্ট। ফরিদ মক্তবে যেত না। দাদার কাছে আমসিপারা পড়ত।

মক্তব থেকে ফেরার সময় বীজতলার ধানের ছোট ছোট চারার মথায় শিশির থাকত না আর। ফরিদও সেখানে থাকত না। স্কুলে যাওয়ার সময় হলে ফরিদ আমাদের বাড়ি চলে আসতো। আমাকে নিয়ে স্কুলে যাবে বলে। কালিবাড়ির বটগাছের কাছে এলেই আমার মুখে হয়ত ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠত। সেটা খেয়াল করে বটগাছের কাছে এলে প্রতিদিনই ফরিদ বলত, "ভয় পাস কেন, আমি আছি না!" স্কুল থেকেও ফেরার পথে ফরিদ আমাকে সাথে নিয়েই ফিরত। কোনো কারণে আমার দেরি হলে সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত আমার জন্য, বটগাছের পথটুকু এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে আমি ঢাকায় চলে আসি কলেজে পড়ব বলে। ফরিদ কোনো কলেজে যায় নি। দাদার সাথে দোকান দেখাশোনা শুরু করে। আমি যতবারই বাড়ি যেতাম, ফরিদকে দেখতাম স্কুলের সময়ের মতোই নির্ধারিত জায়গায় অপেক্ষা করতে, আমার জন্য। বটগাছের পথটুকু এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে। ফরিদ কি প্রতিদিনই আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করত নাকি কোনোভাবে আমার ফেরার সময় জেনে যেত, সেটা কখনো তাকে জিজ্ঞেস করি নি! সেও বলে নি।

বাঁশি বাজানোর খুব শখ ছিল ফরিদের। ঢাকা থেকে ফিরলে প্রায় সন্ধ্যাতেই পুকুরঘাটে বসে নানা গল্প করতাম আমরা। গল্প করতে করতেই সে নেমে যেত ঘাট বেয়ে। তারপর পাড়ের কাদার ভেতর থেকে লুকানো বাঁশিটা বের করে অদ্ভুত সুন্দর সুর তুলতো তাতে। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। দিনের বেলায় কাদামাটিতে বাঁশি ভিজিয়ে রাখলে নাকি বাঁশির সুর খোলে, এমনটাই বলত ফরিদ। আমি বাঁশির অত মাহাত্ম্য বুঝতাম না, শুধু শুনতাম।

কলেজ বৈতরণী পরীক্ষার কারণে আমি বাড়ি যেতে পারি নি অনেকদিন। পরীক্ষা শেষ করেই তাই বাড়ির পথ ধরেছিলাম। রাস্তায় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি জ্যাম ছিল সেদিন। এর মধ্যে পথিমধ্যে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। বাস থেকে যখন নামলাম, সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়ে রাত নেমে গেছে তার অনেক আগেই। বৃষ্টিতে মাটির সড়কের অবস্থা তথৈবচ। প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটু অবধি তুলতে তুলতে ভাবছিলাম, এই বৃষ্টির রাতে একা একা পেরুতে হবে কালিবাড়ির বটগাছের পথটুকু। ফরিদ নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করবে না এতক্ষণ। কখনো এত রাতে বাড়ি যাই নি বলে! তাছাড়া এই বৃষ্টিবাদলার রাতে। ভয়কে জয় করার বয়স হয়ে গেছে আমার ততদিনে। কিন্তু তারপরেও কালিবাড়ির বটগাছকে জড়িয়ে নানা গল্প আর কল্পকথার কারণে মনের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি নিয়েই হাঁটতে শুরু করেছিলাম সেদিন। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম, সেদিনও ফরিদকে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতে দেখে। আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে সেদিনও বলেছিল, "ভয় পাস কেন, আমি আছি না!" ফরিদকে দেখে আমি ভয় পাই নি, বিস্মিত হয়েছিলাম। সেটাকেই হয়ত সে মজা করে "ভয়" বলে থাকবে!

অনেকদিন পরে ফেরার কারণেই কি না জানি না, পথে আমাদের গল্পগুলো জমছিল না। ফরিদও তেমন করে হরবর করে কথা বলছিল না আগের মতো। হয়ত খানিকটা বিরক্তই হয়ে থাকবে আমার উপর। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখেও হাঁটছিল আমার সাথে। কাদা বাঁচিয়ে পথ চলতে হচ্ছে আমাদের, হয়ত সেই কারণেই এই দূরত্ব! আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলো আগের মতোই। আমাদের বাইরের উঠান থেকে তাদের বাড়ির দিকে চলে যাওয়ার সময়ও একইভাবে হাসি দিলো। কিন্তু সেই হাসিটা আমাকে কেমন অস্বস্তি এনে দিলো। হালকা একটা দখিনা বাতাস আমার নাকে পচা কিছুর গন্ধ এনে দিলো। অনেকটা সাপমরা পচা গন্ধের মতো!

ঘরে ঢুকতেই আমাকে দেখে সবাই বেশ অবাক হয়ে গেলো। তারা ভেবেছিল আমি পরের দিন ফিরব। কালিবাড়ির বটগাছের ব্যাপারে আমার ভয়ের ব্যাপারটা বাড়ির সবাই জানতো। এই পথটুকু কীভাবে এসেছি জানতে চাইলে ফরিদের কথা বললাম।

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই দেখি আমার বাবা বসে আছেন বিছানার পাশে। সবসময়েই থাকেন। আমি বাড়ি ফিরলে সকালে ঘুম ভেঙে চোখ খুলেই আমি বাবাকে দেখি। বাবাকে দেখেই আমার দিন শুরু হয়। সেদিনও হলো। অন্য সববারের মতোই ঠাট্টা দিয়ে বাবা তাঁর কথা শুরু করলেন, "গত মাসে ফরিদ মারা গেছে!" আমি পাশ ফিরতে ফিরতে হাসতে হাসতেই বলি, "হ্যাঁ, তার কুলখানি তো খেলাম আমিও।" এবারে আমার ঠাট্টার জবাবে বাবা বরাবরের মতো না হেসে বেশ গম্ভীর হয়ে বলতে থাকলেন, "গেল পূর্ণিমায় ফরিদ অনেক রাতোবধি পুকুরপাড়ে বাঁশি বাজিয়েছিল। আমরা সবাই তার বাঁশির সুর শুনেছি, অন্য অনেক সন্ধ্যার মতোই। আমরা ঘুমোতে যাওয়ার সময়েও ফরিদ বাঁশি বাজিয়েই যাচ্ছিল। পরদিন সকালে উঠে পাড়াশুদ্ধ লোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে জানতে পারি পুকুরে ফরিদের লাশ ভাসছে...!" বুঝতে পারছিলাম, বাবা মোটেও ঠাট্টা করছেন না!

বাবা যখন বলছিলেন, মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজার কাছে। আমি তাঁর চোখে চোখ রাখতেই সে চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলাম। মায়ের ভয়ের কারণটা বুঝতে পেরে শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গিয়েছিল আমারও।

ঘটনার আকস্মিকতায় ধাতস্থ হতে একটু সময় লেগেছিল আমার। দুপুরের দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে দখিনমুখো পথে ফরিদদের বাড়ির উঠান পেরিয়ে তার দাদার দোকানের সামনের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম। তার দাদা দোকানেই বসে ছিলেন। আমাকে লক্ষ্যই করলেন না। সাধারণত যেটা উনি করেন না। দোকানের সামনে দিয়ে যে-ই হেঁটে যাক, তিনি অন্তত চোখ তুলে তার দিকে একবার তাকান। আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। খুব স্বাভাবিক কারণেই ফরিদকে কোথাও পেলাম না, অন্য সময় হলে যেখানে তাকে পেতাম, সেখানেও না। কোথাও না।

পুকুর ঘাটে গিয়ে ফরিদ যেখানে বাঁশি ভিজিয়ে বা লুকিয়ে রাখত, সেখানে নেমে গেলাম। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঁশিটা কোথাও পেলাম না। দিনের বেলায় ফরিদ কখনোই বাঁশি বের করত না কাদাপানি থেকে। তাহলে বাঁশিটা গেল কোথায়!

সেদিন সন্ধ্যার পরেও পুকুরঘাটে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। এরপর যতদিন বাড়িতে ছিলাম, প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর, রাতোবধি বসে ছিলাম সেখানে। ফরিদের দেখা পাই নি। পুকুর ঘাটে বসে তার বাঁশির অদ্ভুত সুর শুনি নি আর।

অনেকদিন বাড়িতে কাটানোর পর যেদিন আবার ঢাকায় ফিরে যাব, তার আগের রাতে ছিল উপচে পড়া জোছনা। সেদিন সন্ধ্যায়ও পুকুরঘাটে বসেছিলাম। সন্ধ্যা গড়ানোর সাথে সাথেই বাবা গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর চোখের আড়াল করেন নি। সবাই একসময় ঘুমিয়ে পড়লেও আমার ঘুম আসে নি। এর অনেক পর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বারান্দা ছাড়িয়ে উঠোনে নেমে এসে দেখি জোছনার বানে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। উঠোন পেরিয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দখিন দিকে চলতে শুরু করেছিলাম। ফরিদের দাদার দোকানঘরের কাছাকাছি যেতেই অদ্ভুত এক স্নিগ্ধ আলো চোখে পড়ল দোকানঘরের ভেতর থেকে। সেদিকে এগিয়ে দোকানঘরের পেছনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল সাদা আলোয়। ফরিদের দাদা বসে আছেন দোকানঘরের ভেতরের চৌকিতে। চৌকির চার কোনায় চারজন মানুষ। তাদের শরীর থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে আলো, উজ্জ্বল নিয়ন বাতির মতো! সারা ঘরে তীব্র ঘ্রাণ, মনে হচ্ছিল আমি একটা জায়গায় বসে আছি আর আমার এক বর্গমিটারের মধ্যে আছে ফুলের ভারে নুয়ে পড়া কয়েক লক্ষ কামিনী গাছ! গন্ধের তীব্রতায় মাথা ঘুরছিল। সাথে সাথেই শরীরে প্রবল এবং আচমকা ঝাপটা

অনুভব করলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম নিয়ন বাতির মানুষগুলোর আলো ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। হঠাৎ কানে এলো ফরিদের দাদার চিৎকার, "আমার এই নাতিটারে বখশ দে... অরে খাইস না তোরা... দোহাই লাগে তোগো..."

চোখ খুলে নিজেকে নিজের বিছানায় আবিষ্কার করি। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম হয়ত। বাইরে হট্টগোল শুনতে পাই। বারান্দায় এসে শুনি, ফরিদের দাদার লাশ পাওয়া গেছে। কালিবাড়ির বটগাছে। ঝুলন্ত। গলায় বহু পুরাতন সেই বটগাছের শেকড় প্যাঁচানো।

ভূত একটি ভ্রান্ত ধারমা মাত্র

নজরুল ইসলাম
ami.nazrul@gmail.com

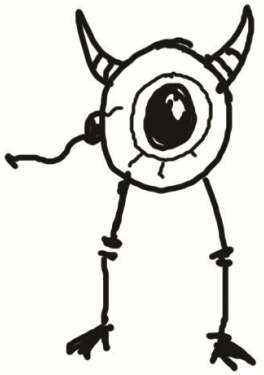

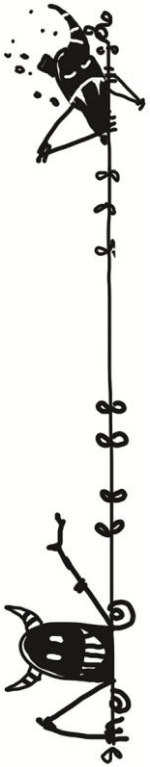

ভূত বিষয়টার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ছোটবেলায়, গ্রামে যাবার পর। এর আগে হয়ত ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকেও বেশ ঘুম টুম পাড়ানো হয়েছে, কিন্তু সেসব আমার খেয়ালে নাই।

আমার এক গ্রামাতো ভাই গ্রামের স্টেশন বাজারে বইয়ের দোকান চালাত। গ্রামে সেটাই একমাত্র বইয়ের দোকান। সেই মতি ভাই মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতো বাংলাবাজার থেকে পাইকারি দরে বই কিনতে। তিন কেলাশ পাশ দিয়ে ফেলছি, মতি ভাইও আসছেন ঢাকায়। বায়না ধরলাম গ্রামে যাবো। আমি আর আমার পিঠাপিঠি বোন, দুজনে ঝুলে পড়লাম মতি ভাইয়ের কান্ধে। গন্তব্য বেলদিয়ায় দাদাবাড়ি।

যাওয়ার পথে বাংলাবাজারে এবং বইয়ের রাজ্যে প্রথম প্রবেশ। যা হোক, সে ভিন্ন গল্প। আমরা ভূতের গল্পেই থাকি। তো গ্রামে গেলাম। গিয়ে দেখি পুরো মচ্ছব বসে গেছে। মানে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সময় খালে বিলে জাল গামছা এসব দিয়ে প্রচুর মাছ ধরা হইছে। ঘরে ঘরে মাছের মচ্ছব। পাঁচমিশালী মাছ। এত মাছ খাবে কে? গ্রামে তো বিদ্যুতই নাই, ফ্রিজ তো দূরের কথা। কিছু মাছ শুঁটকি দেওয়া হলো, বাকি সব মাছ সবাইকে খেয়েই শেষ করতে হবে। শুরু হলো ভাতের মতো মাছ খাওয়া।

মাছ খেতে খেতেই শুরু হলো ভূতের গল্প। ভূতের না আসলে, জ্বীনের গল্প। আমার চাচাতো ভাই তাহের, গল্প শুনে বোঝা গেল তাঁর একটা ভূতের ব্যারাম আছে। পৃথিবীর যেখানেই যান তিনি, ভূত যাবে তাঁর সঙ্গে। এমন দুর্ধর্ষ রকমের ভূতের গল্প তিনি বলেন, শোনার সময় একটু পর পর মেরুদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দিনেদুপুরে মনে হয় আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ভয়ঙ্কর পাজি কোনো ভূত, এক্ষুনি আমার ঘাড়টা দেবে মটকে।

“বুঝলা, একবার গেলাম মাছ মারতে, আমি তো আসলে যাই নাই, জ্বীনে আমারে টাইনা নিয়া গেছে। আমি তো দেখি দিন, কিন্তু আসলে তখন দিন না, ভোরবেলা। তারপর বুঝলা, পুষ্কুনির কাছে তো গেছি, গিয়া দেখি পুষ্কুনির পানিতে মাছের মেলা বসছে, বড়শি আর পাততে হবে না, খেউ দিলেই মাছ ধরা যাবে শয়ে শয়ে। সেই লোভে লুঙ্গিটা কাছা দিয়াই তো পুষ্কুনিতে নামলাম। খালি মাছ ধরি আর ধরি... ধরি আর ধরি... নানান পদের নানান রঙের মাছ... নানান ঢঙের মাছ... মাছের কোনো শেষ নাই... এইসব মাছের নাম আমি কোনোদিন জানি না... তারপর দেখি পুষ্কুনির মাঝখানে... শুনলে বিশ্বাস করবা না... একটা মৎস্যকুমারী... কী সুন্দর তার রূপ... সোনার মতো চকচক করতেছে... আমারে ডাকে... আমি যাইতেছি... যাইতেছি যাইতেছি... কই যাইতেছি জানি না... একবার মনে হইলো আমি পাতালপুরীতে চইলা গেছি...”

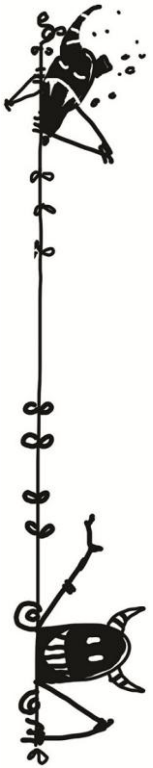

যখন হুঁশ ফিরল, তখন নাকি তাহের ভাইকে পাওয়া গিয়েছিল পুকুরপাড়ে অচেতন অবস্থায়। সমস্ত শরীরে কালশিটে দাগ!

এরকম অসংখ্য গল্প। তিনি রাতে শুয়ে থাকেন ঘুমায়ে। ভূত নাকি তারে ডেকে নিয়ে যায় পাশের বাঁশবাগানে, কিন্তু দরজা খুলতে হয় না, জানালার শিকের চিপা দিয়েই নাকি জ্বীন ভূতেরা তারে টেনে নিয়ে যায় আর রসগোল্লা খাওয়ায়!

খবরের মধ্যে খবর হচ্ছে, এই তাহের ভাইকে আজীবনই ভোরবেলা পাওয়া গেছে হয় বাঁশঝাড়ে, নয়তো পুকুর পাড়ে, নয়তো কবরস্থানে... অচেতন অবস্থায়। গ্রামের সকলের ধারণা জ্বীনের আছর। ফলে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলেও তার বিয়ে হয় না।

যা হোক, সেই প্রথম আমার ভূতের ভয়ের শুরু। কিছুদিন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বিশেষ করে গ্রামে যতদিন ছিলাম, ভূতস্পন্দিত হৃদয়ে মনে হতো, আমিই তাহের!

খুব বেশিদিন লাগে নি আমার ভূতের ভয় কাটতে। কিন্তু তাহের ভাইয়ের কাছে যে গল্পগুলো শুনেছিলাম তা স্মৃতিতে রয়ে গেছে আজীবন। এতো বাস্তব, এতো প্রাণবন্ত গল্প বলিয়ে আমি জীবনে তৃতীয়টি দেখি নি।

তৃতীয়টি বললাম এ কারণে যে দ্বিতীয় একজন এরকম প্রাঞ্জল গল্প বলিয়ে আমি পেয়েছিলাম। খুলনার লোক, রানা মামা। তখন বেশ বড় হয়ে গেছি। চাকরি করি। মহাখালী ডিওএইচএস- এ অফিস। একই পাড়ায় আরেকটা বায়িং হাউজ আছে, সেখানকার চারজন পরিচালক, চারজনই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন, আমাদের চার মামা। ভীষণ আমুদে ফুর্তিবাজ তারা। সারাক্ষণ পার্টি মাচায়, ভয়ঙ্কর জুয়া খেলে, ড্রিঙ্ক করে... এলাহি কাণ্ড। সেই মামাদেরই আরেক বন্ধু রানা মামা, খুলনায় চিংড়ির ঘের আছে। এক মদিলা রাতে সোনালি শিশির আর পোড়া মুরগির সঙ্গে শুরু হলো রানা মামার গল্প। সে এক ভীষণ ব্যাপার।

ততদিনে আমি দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়। সেই কিশোর বেলাতেই ড্রাকুলা পড়ে একলা এক ঘরে নিজে মশারি টানিয়ে ঘুমিয়েছি নিশ্চিন্তে, একটুও ভয় করে নি। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে মিরপুর কবরস্থানে একা একা সারারাত বসে থেকেছি নির্ভয়ে। কিন্তু রানা মামার গল্প শুনে সেই মাতাল অবস্থাতেও ভয় ধরে গিয়েছিল।

এমনিতে আমি ভূতের সিনেমা টিনেমা দেখি না। ভয়ের জন্য না, ভালো লাগে না। ভূতের সিনেমাগুলোতে দর্শককে ভয় দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে নির্মাতারা অহেতুক যা যা করেন, তা দেখে ভয় জাগে না, কিন্তু বিরক্ত লাগে খুব। ঘিনঘিনে একটা ব্যাপার হয়। এজন্য দেখি না।

ভূতে আমার অবশ্যই কোনো বিশ্বাস নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজে খুব ভূত হতে ইচ্ছে করে। কোন ভূত? আমার চেনা অনেক সুন্দরীকে দেখেছি তাদের প্রেমিককে আদর করে ভূত ডাকতে। আমাকে কেউ ডাকল না। সেই খেদ মনে নিয়ে আঙুর ফল টকের মতো তাই বলি - ভূত একটি ভ্রান্ত ধারমা মাত্র।

মাউবর চাচার জ্বীন

প্রকৃতিপ্রেমিক

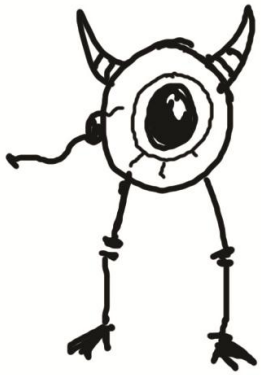

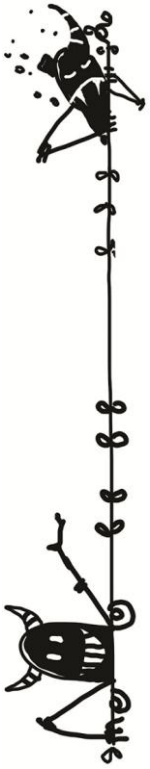

সেবার বেশ শীত পড়েছিল। ফি বছর গ্রামে গিয়ে শীতের সময়টুকু কাটাতে অসম্ভব ভালো লাগতো। প্রতি বছর এই সময়টাই যেন স্বর্গীয় একটা সময়। টমটমে চড়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে যাওয়া, হাটের দিনে হাটে গিয়ে গুড়ের জিলেপি খাওয়া কিংবা কালাম চাচার দোকানে বসে দোকানদারি, কোনোটাই কোনোটার চেয়ে ছোট নয়। সেই সাথে আনিছফর আর হক ভাইয়ের কাছ থেকে সত্য- মিথ্যা মেশানো জ্বীনের গল্প শোনা হবে, এই আশাতেই যেন দিন গুনতাম কখন দাদাবাড়ি যাওয়া হবে। একসময় আব্বার ছুটি মিলত, আমাদের স্কুলও বন্ধ হতো।

"বুঝলা বাবারা, তোমরা হল্যা টাউনের ছোল- পোল, পল্লী কি আর তোমাগেরে ভাল্লাগবি?" মাউবর চাচার গলা দিয়ে এই শব্দগুলোই বের হয়ে আসে।

সবে মাত্র সাঁঝ নেমেছে। একটা বাদুড় ডানা ঝাপটিয়ে বাড়ির সামনে থেকে উড়ে পেছনের কলাগাছে পড়ল। পাতার আলোড়ন বেশ স্পষ্টই শোনা গেল। উঠোনের উপর পাটি পেতে বসেছি সবাই। মহাতাব, আবুল কালাম, আনিছফর আছে। হক ভাই এখনো আসে নি। মাউবর চাচাকে অনেকটা জোর করেই আমাদের এই জটলায় ধরে এনেছি।

মাউবর চাচা ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ। বাড়ি থেকে আনুমানিক ২ মাইল দূরে তার মাদরাসা। মাদরাসার সাথে লাগোয়া মসজিদ। কখনো হেঁটে আবার কখনো সাইকেলে চড়ে মাদ্রাসায় যান। বাড়িতে চৌচালা টিনের ঘর, পাকা মেঝে। বারান্দাওয়ালা বসতবাড়ির সামনে খোলা উঠান আর বাড়ির পেছনে বর্ধিত খোলা জায়গা বেশ খানিকটা প্রসারিত হয়ে বাঁশের আড়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ঘন সেই বাঁশের আড়া। অনেকদিনের পুরোনো একটা আম গাছ আর কয়েকটা গামারি গাছও আছে। এদিককার বাড়ির ভিতরেও উঠোন থাকে। উঠোনের একপাশে রান্নাঘর, তার পাশে বহুদিনের পুরোনো একটা বেল গাছ। উঠোনের ঠিক মাঝখানে বেখাপ্পা ধরনের শীর্ণকায় একটা নারিকেল গাছ। দেখলেই বোঝা যায় বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ডাব- নারিকেল হয় বলে মনে হয় না।

"চাচা আপনার কাছ থেকে আজ ছোটবেলার কথা শুনতে চাই। হক ভাই সেদিন বললেন আপনি নাকি জ্বীন দেখেছেন? সেই গল্পটা আজ শোনাতে হবে।"

"জ্বীনের গল্প আর কী শুন্যামু বাবা, এই ভরা সন্দ্যায় সেই কত্যা বলা ঠিক হবি ন্যা," অনিচ্ছার সুর চাচার গলায়। কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা। শেষমেষ গল্প শুরু করলেন চাচা।

"সে মেল্যা দিন আগের কথা, মাদরাসা যাওয়ার পথে সরদারগের আরা-কুরকাব জঙ্গল। দিনের বেলাও সেদিকে কেউ যাবার সাহস করে না। তোমার

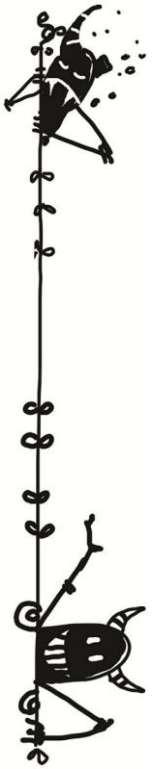

দাদার কাছ থেকে শুনছি দিনেদুপুরে অনেকেই আড়ার মধ্যে বড় বড় শুয়োর আর রামছাগল বসে থাকতে দেখছে।"

আমি বলি, "চাচা, আড়ার মধ্যে শুয়োর তো থাকতেই পারে। আর রামছাগলও তো কারো না কারো হতে পারে।"

"না বাবা, এরা হলো জ্বীন। রামছাগল কি আর ঘোড়ার সমান উঁচু হয়? আর গায়ে অসম্ভব গন্ধ, এরা বাজে জ্বীন। জ্বীনের দেশে এরা পায়খানা সাফ করে, তাই এদের গায়ে এত গন্ধ।"

আমি আগ্রহ কিছুটা হারিয়ে ফেলি। "চাচা, আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আজ শোনাতেই হবে। সরদারদের আড়ায় কি এখনো কিছু দেখা যায়?"

চাচা একটু নড়েচড়ে বসেন।

"শোনো, গত রমজানের আগের রমজানের ঘটনা।" চাচা শুরু করেন।

"তারাবির নামাজ পড়ে বাড়ি আসতেছিলাম। তোমার জলিল চাচার বাড়ি পার হয়্যা সরদারগের আড়ার পাশ দিয়ে হ্যাঁট্যা হ্যাঁট্যা আসতেছি। জোসনা রাত। চারদিকে আবছা আবছা দেখা যায়। আড়ার তলে আস্যা ফুস কর্যা জোসনা নিভ্যা গেল। খানিক্ষণ থাম্যা কুলহুআল্লাহ তিনবার পড়্যা বুকেত ফুঁ দিয়্যা আবার হাঁটা ধরলাম। আড়ার মদ্যে দিয়ে যে রাস্তা, সেড্যা পার হতে বড়জোর পাঁচ- দশ মিনিট লাগে। কিন্তু রাত- বিরাতে এই পথই মনে হয় এক ঘণ্টার হাঁটা।" এই বলে চাচা আরেকটু নড়েচড়ে বসলেন।

"হঠাৎ শুনি পাতার খসমস আওয়াজ। থ্যাম্যা পেছনে তাকায়্যা দেখলাম কেউ আসতেছে নাকি। নাহ, কেউ তো নাই। আবার হাঁটা ধরলাম। দুই কদম ফেলতেই আবার সেই খসমস আওয়াজ। এবার মনে হচ্ছে কেউ কিছু একটা ট্যান্যা নিচ্চে, সেরকম শব্দ। কুল- কালেমা সব উচ্চস্বরে পড়া শুরু করল্যাম। তারপর আবার সব নীরব।"

এই বলে চাচা থামলেন।

আমরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, "চাচা এরপর কী হলো?"

"এর পরেই তো আসল কাহিনি," চাচা ঠোঁটের কোনায় হাসি ঝুলিয়ে বলেন।

"গেলাফটা ঠিকমতো জড়িয়ে নিলাম, একটু একটু জার করে।"

"কই, আমার সাথে মশকরা? আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! এই কয়্যা যেদিক থেকে শব্দ আসতিছিল সেদিক আগায়া যাই আর উচ্চস্বরে কুল- কলমা পড়তিছি। আমি বুঝছি যে এটা ছোটোখাট কোনো জ্বীন, আমাক ভয় দেখানোর চেষ্টা করতিছে। মনে মনে কই, আমার ভয় দেখাবু এত্ত বড় সাহস তোর! তোর মতো কডিডরে শিশিত ভড়্যা মরাঘাটিত পুঁতে রাখল্যাম।"

আমি তখন অনেক ছোট। এইটুকু শুনে ভয়ে হাতপা আমার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। "তারপর কী হলো চাচা?"

"আমার আগানো দেখ্যা জ্বীনের বাচ্চা পড়িমরি করে ছুট লাগালো। আবছা অন্ধকারে যা দেখল্যাম তাতে বুঝলাম মানুষের মাথার খুলির মতো কিছু একটা এদিক থেকে ওদিকে যাচ্চে আর শুকনা পাতার সাথে ল্যাগ্যা খসখস শব্দ হচ্চে। আমি কই, এই তুই কে রে? আমাক ভয় দেখাচ্ছিস? তোর এত বড় সাহস!"

চাচার সাহস দেখে আমাদের জানে প্রাণে ফিরে পেলাম। চাচা বলে চলেন-

“আমার ধমক খায়্যা কাটা মুণ্ডুর মতো জিনিসটা একসময় থাম্যা গেল। খসখস শব্দটাও নাই। সব আবার শুনশান।”

“এরপর কোনোমতে বাড়ি চলে আসি। সে রাত্রে গা কাঁপায়্যা জ্বর আসে।”

এর পরের ঘটনা হক ভাইয়ের কাছ থেকে আগেই শুনেছি। জ্বরের মধ্যে চাচা নাকি আবোল তাবোল অনেককিছু বলেন। যার সারমর্ম হলো কোন দিন হাট থেকে ফিরে বাড়ির পেছনে ময়লা ফেলতে গিয়ে কোনো জ্বীনের গায়ে ময়লা ফেলেছিলেন। তার প্রতিশোধ নিতেই তাকে ভয় দেখানোর সেই চেষ্টা।

“বাবারা এবার তোমরা ঘুমাওগে, কাল বুড়ো জ্বীনের সাথে মোলাকাতের গল্প শোনাবোনি।”

হারিয়ে যাওয়া ভূতেরা আমার

তারেক অণু

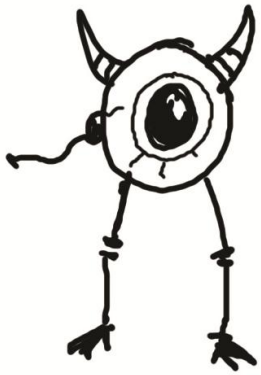

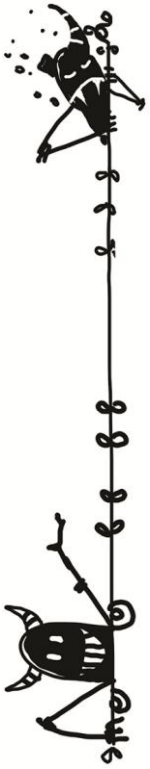

টিমটিমে পিদিমের আলো চারপাশের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারকে দূর করার বদলে আরও ঘন করে তুলেছে, ফ্যাসফ্যাসে গলায় পাড়াতো এক দাদী বলে চলেছেন তার চাচার ঘটনা - আলেয়ার আলো তাকে কী করে গঞ্জ থেকে ফিরবার পথে ডেকে নিয়ে বিলের কাদাপানিতে ডুবিয়ে মারতে লেগেছিল, সেই সত্য ঘটনার গল্প। থেকে থেকেই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে, কণ্ঠ শুকিয়ে আসায় ঢোক গিলছি কিন্তু পানীয়ের সন্ধানে একা যাবার সাহস উবে গিয়েছে অনেক আগেই। শ্রোতা শিশুরা পারলে দাদীর শরীরে লেপটে গিয়ে ভয় এড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আসর থেকে যাচ্ছে না কেউই। দুটো কারণ: এক- গল্পটা শেষ পর্যন্ত শোনা, দুই- যদি ভূত এসে হানা দেয় একা উঠে গেলে!

গ্রামের বাড়ির গল্প এইসব, দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি, খালার বাড়ি বেড়াতে গেলেই বৈদ্যুতিক বাতির অনুপস্থিতিতে ভিড় করত অশরীরীর দল চারপাশে। বিচিত্র সব নাম ছিল তাদের, অনেকেই আঁধারে সেই সব জীবদের নাম না নিয়ে বলতেন তেনারা! (মানে উনারা), তারা নাকি আবার মানুষের রূপ ধরেই আসে, মিশে থাকে সবার মাঝে। গলা নামিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমন ভঙ্গিতে বলতেন, অবশ্য তাদের চেনার একটি সহজ উপায় আছে, উনাদের পায়ের পাতা উলটো দিক করে অবস্থান করে! এর পরপরই শুরু হতো হৃদয়ে ভীতির ক্ষরণ আর রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হওয়া, ঘোরের মাঝে মনে হতো গল্পকথকই হয়ত ছদ্মবেশী ভূত, বারংবার দেখার চেষ্টা করতাম তার পায়ের পাতা সাধারণ মানুষের মতো, না উলটো দিকে অবস্থিত! এমনকি আশেপাশের পরিচিত খেলার সাথীদেরও মনে হতো ভূতের ছানাপোনা, চোরের মতো আড়চোখে পরীক্ষা করতাম সবার পায়ের গোড়ালি!

দাদাবাড়ি যে গ্রামে তার নামটিও যেন কেমন- ভয়ালপুর! নামেই একটা ভয়াল ভয়ংকর ভাব, কাছেই বিশাল জঙ্গুলে জায়গা, সেখানে নাকি বিশেষ ধরনের ভূত থাকে, স্থানীয়রা তাকে বলত মাদার! সে আবার বিশাল জটাধারী। মাঝে মাঝে পথ ভোলা কেউ সেই জঙ্গলে প্রবেশ করলে জটা দিয়ে গালে বাড়ি দিয়ে নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন এঁকে দিত সপাটে! তার জন্য আবার বিশেষ থান ছিল, সেখানে পূজো চড়ানো হতো সেই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য!

আর ছিল রূপকথার বইয়ের জগত, একটা পাতলা বই ছিল রাক্ষস-খোক্কস- দৈত্য- দানো নামে, বোঝেন তাহলে বইয়ের গল্পগুলো কেমন ছিল! কত ধরনের ভূতেরা সেখানে - কন্ধকাটা, ব্রহ্মদত্যি, পেত্নী, শাঁখিনী, ডাকিনী, ডাইনি অভাব নেই সেই মিছিলে! প্রাইমারিতে পড়ার সময় হাতে আসলো ভিনদেশি ভূতেদের কাহিনি - রক্তচোষা ড্রাকুলা, ভাইকিংদের শয়তান লোকি, নরওয়ের ট্রোল, মধ্য ইউরোপের ল্যান্ট্রান। এমন চরিত্র জড়ো হতে থাকে মনে আঙিনায়, কিন্তু বেরিয়ে যেতে থাকে তারা একে একে মনের গহনে জমে থাকা ভয়ের কুয়ো থেকে।

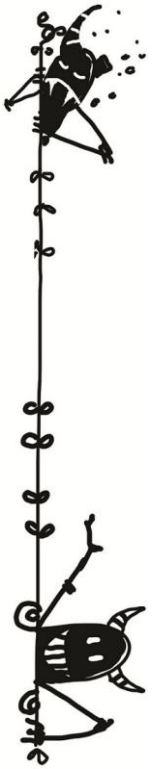

হারিয়ে যেতে থাকে আমার ভূতেরা, তাদের অস্তিত্বের সাক্ষীর কথায় গোঁজামিল খুঁজে বের করি চোখের নিমিষে, জ্বীনদের কথা আসলেও হেসেই উড়িয়ে দিই, বরং বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে থাকি রহস্য পত্রিকায় প্রকাশিত হাসির মজার ভূতের গল্প!

এক পর্যায়ে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায় মনোজগৎ থেকে, এটাকে কি বড় হওয়ার টোল বলা যায় নাকি যুক্তিবাদী হবার ফলাফল, তা জানা নেই!

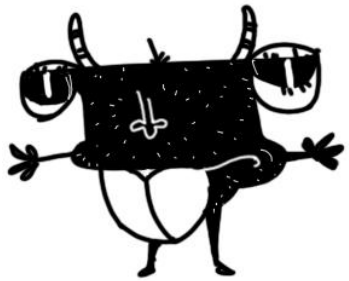

ভুড়ুতুড়ে

আশালতা
lotaa17@gmail.com

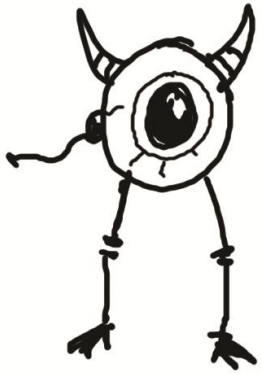

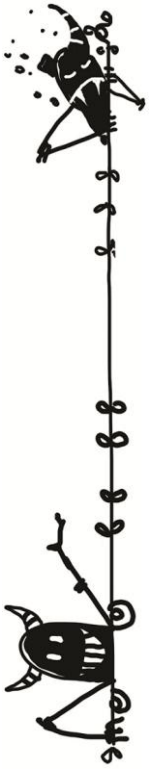

ভূতের ছবি আঁকা মোটা মোটা বই নিয়ে ছুটিতে মেজোদা বাড়ি আসত। মা বলতেন ওগুলো সব ডাক্তারি বই। ডাক্তার হতে গেলে ভূত প্রেত পড়তে হয় কেন সেটা তখন মাথায় ঢুকত না ভালো। তবে মেজোদাকে এড়িয়ে চলতে হবে এটা বেশ বুঝতাম। একদিন দাদা ডেকে বললেন, এত জ্বীন- ভূতের ভয় পাস কেন বল তো! দেখেছিস কখনও? মাথা নাড়তেই বললেন, তা দেখবি কী করে? শহরে কি ভূত হয় নাকি? এখানে ইলেকট্রিকের তার আছে যে, ওইতে ওদের বেজায় ভয়। আমরা তো মাটির তৈরি, মরলে মাটিতেই মিশে যাই, ওরা হলো আগুনের তৈরি, তাই আগুনেই ওদের মৃত্যু। শহর জুড়ে ইলেকট্রিকের তারে আগুন ছড়ানো; এইখানে ওরা তাই আসে না।

এত বড় ভূত- তত্ত্বের পর আমাদের বেজায় সাহস হলো। জ্বীন ভূত তল্লাটে নেই জানলে সকাল সন্ধ্যে ইচ্ছেমতো দাপানো চলে। মুশকিল হতো নানুবাড়ি গেলেই। সেখানে তখনও ইলেক্ট্রিসিটি পৌঁছায় নি। পুকুর বাগান উঠোন আর পেল্লায় সব পুরোনো গাছগাছালিসমেত বিশাল বাড়িটা সন্ধ্যের পর কী নিঝুম দুপুরে যেন হাঁ করে গিলতে আসে। এদিকে স্কুলে ছুটিছাটা হলেই মা নয়ত মামাদের কেউ আমাদের সবকটাকে ধরে এনে নানুর কাছে দিয়ে যেত। তখন সারাদিন ইচ্ছেমতো হুড়োহুড়ি করলেও সন্ধ্যের পর সব কটাই জুজুর ভয়ে কাবু। অত বড় বাড়িটায় লোকজন তখন কেউ নেই। কামলা- কিষানেরা কাজশেষে নিজেদের ঘরে চলে যেত। নানু একা একা বুড়ো মানুষ এতগুলো আতঙ্কিত বীর- বাহাদুরকে নিয়ে পড়তেন মহা যন্ত্রণায়। একটা মাত্র প্রাচীন হারিকেন এবং ততোধিক প্রাচীন নানু দুজনকেই জবরদখল করে চারপাশে সবকটা গোল হয়ে বসে থাকতাম। সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার সন্ধ্যাগুলোয় পঙ্খীরাজ ব্যাঙ্গমা- ব্যাঙ্গমিরা সত্যিকারের প্রাণ পেত সহজেই।

মাঝে মাঝে খই- মুড়ি ভাজতে আসতেন রাঙা পিসি। গরীব ঘরের প্রাচীন বিধবা। ময়লাটে মোটা ধুতির কাপড়ে শীর্ণ শরীরটা কোনোমতে জড়ানো। তোবড়ানো গাল মুখের অসংখ্য বলিরেখা ছাপিয়েও বসন্তের ছোপছোপ দাগগুলো ভেসে থাকত ভীষণভাবে। উঠোন লাগোয়া একটেরে রান্নাঘরটায় বিরাট লোহার কড়াইটা চুলায় চাপিয়ে লবণমাখানো চালের গরম গরম মুড়ি ভেজে দিতেন সারা সন্ধ্যা জুড়ে। নয়ত গুড়ের মুড়কি। চুলোর চারপাশ ঘিরে বসে বেতো ধামা করে সেইসব মুড়ি মুড়কি চিবোতে বসে গুটুর গুটুর গল্পও হতো এন্তার।

ঠোঁটকাটা তপুটা একদিন ফট করে বলে বসল, ও পিসি, তোমার নামটা এমন কেন? প্রশ্ন শুনে হারিকেনের ঘোলা আলোয় কুলোর ধান বাছতে বাছতেই পান খাওয়া কালো কালো ফোকলা দাঁতে পিসি হেসে উঠল খলখলিয়ে। তারপর চুপ হয়ে গেল হঠাৎ। বাইরের গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দূরাগত গলায় বললেন, আগে তো এমন ছিলাম না রে বাবু। ওই আলতার মতোই রাঙা ছিলাম যে। তারপর একদিন মা শেতলা আমায় দয়া করলেন। আমি ঠোঁট উলটে বললাম, বারে, দয়া করলে লোকে দেখতে পচা হয়ে

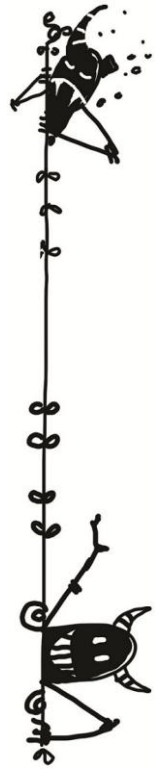

যায় বুঝি? কেমন একটা অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাতের কুলোটা নামিয়ে রেখে ধীর গলায় বললেন, শোন তবে।

"... তখন আমি বেশ ছোট। ফ্রক পরে দৌড়ে বেড়াই। ফুল কুড়োবার নেশা ছিল খুব। রোজ ভোরে দক্ষিণের পুকুরটার পাড়ের শিউলি গাছটার তলায় হামলে পড়তাম। সেবার যখন খুব জোছনা হলো, শিউলি গাছটা একেবারে পাগল হয়ে গেল যেন। ফুলের ভারে ডাল ভেঙে পড়বে এমন দশা। এদিকে মা যেতে দেয় না। রোজ সকালে উঠেই একগাদা কাজ গছিয়ে দেয়। একদিন সই বেণির সাথে মিলে ষড় করলাম দুজনে মিলে আরও আগে খুব ভোর ভোর হতেই গিয়ে সব ফুল নিয়ে আসব, তাহলে মা আর বকতে পাবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সেদিন রাতেই বেণি যখন আমায় ডাকতে এলো, ঘুম থেকে উঠে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন সময় কত জানি না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি জোছনার বানে ঘর দুয়ার সব ভেসে যায়। অমন ফিনিকফোটা জোছনা আগে দেখি নি কোনোদিন। কিন্তু অত আলোতেও সামনের বেণিকে কেন যেন দেখাই যাচ্ছে না ভালো করে। বলি, ও বেণি, এত ছুটে চললি কোথায়, একটু দাঁড়া, আমি যে অত ছুটতে পারি না। কে শোনে কার কথা। বেণি যেন পাখা পেয়েছে। বেণি আগে আগে, আমি পেছনে। দুজনে মিলে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। শুনশান পথঘাট, কেউ কোথাও নেই। মনে হচ্ছে দুনিয়ার কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই, শুধু আমি আর বেণি। যেতে যেতে যেতে যেতে অচেনা এক জায়গায় গিয়ে থামলাম। সেখানে বিশাল এক শিউলি গাছের নিচে থরে থরে ফুল ঝরে আছে। অমনি বসে পড়ে ফুল কুড়োতে লাগলাম। কোঁচড় উপচে যাচ্ছে যখন, তখন 'বেণি' 'বেণি' বলে ডেকে তাকাতে দেখি কোথায় বেণি! ধবধবে জোছনায় শিউলির গাঢ় ঘ্রাণ নিয়ে সামনের খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হা হা করে হাওয়া বয়ে চলেছে শুধু। সেই নিঝুম রাত্তিরে সেই মাঠের পাড়ের গাছতলায় আমি একা। না, একাও ঠিক না, গাছের নিচে কে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে।

ধবধবে সাদা থান দেখে হঠাৎ ভ্রম হলো যেন মানদা দিঠান। কাছে এগিয়ে যেতে হাতটা এগিয়ে দিলেন। সেই হাতে ফুল দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, আরে! এ কী করছি! মানদা দিঠান এখানে আসবে কী করে, সে তো আগের বছরেই স্বর্গে গেছে। এই কথা মনে পড়তেই চমকে হাত সরিয়ে নিয়ে ঘোমটা দেয়া মুখটার দিকে চাইতেই দেখি সেখানে নাক মুখ কিচ্ছু নেই! শুধু একরাশ অন্ধকারের মাঝে ঝকঝকে দুটো চোখ তাকিয়ে আছে... উহ! সে কী চাউনি..."

"তারপর, তারপর পিসি? তারপর কী হলো?"

"তারপর আর জানি না রে। সেই দেখে চিৎকার দিয়ে আর কিছু মনে নেই। সকালে সবাই আমায় শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনেছিল, অচেতন। সেইদিন বিকেলের মাঝেই বসন্তের গোটা বেরুলো শরীর জুড়ে। যমে মানুষে কতদিন টানাটানি হয়ে প্রাণটা বাঁচল বটে তবে চেহারাটা গেল সেই থেকেই। নামটাই শুধু রয়ে গেল। কিন্তু ও কী রে তপু, গপ্পো শুনতে চেয়ে তুই দেখি ভয়েই..."

কথা শেষ হবার আগেই এশার নামাজ শেষে তসবিহাতে নানুকে ফিরতে দেখে পড়ি কি মরি ছুটে গিয়ে সব কটা বীর- পালোয়ান ততক্ষণে নানুর চাদরের তলায়।

রাঙা পিসি, নানু, কালী জ্যাঠাদের কাছে এইসব গল্প শোনার দিনগুলো নেই আর। কিন্তু সেই ভয় পাবার অভ্যেসটা থেকে গেছে। এখনও ঝড়- জলের রাতে শোঁ শোঁ হাওয়া বইলে অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ছেলেবেলার সেইসব ভয় পাওয়া গা ছমছমে সময়গুলো ফেরত আসতে চায়। কিন্তু মেজোদার ভূত- তত্ত্বকে সত্যি করেই বোধ হয় আজীবন শহরে থেকে সত্যিকারের ভূত দেখে ভয় পাওয়া আর হয় না।

তবে এবারের কথাটা আলাদা। এত আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরেও যেটা কখনও হয় নি, খোদ এই ঢাকা শহরে বসেই সেই অসম্ভব কীভাবে যেন সম্ভব হয়ে গেল।

কদিন আগে একটা সত্যিকারের জলজ্যান্ত ভূত মানে পেত্নী দেখে ফেললাম। তাও কিনা একদম নিজের বাসাতেই!

এক একটা দিন থাকে যেদিন সব অন্যরকম হতে থাকে। এরকম একটা দিনে... আরও ভালো করে বললে বলতে হয় রাতে, খুব অন্যরকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল। এমনিতে ঘুমকাতুরে বলে কিছু সুনাম আমার বরাবরই আছে। একবার ঘুমোলে আর সাড়াশব্দ নেই। সেদিন কী যে হলো, মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ভীষণ পিপাসায়। উঠে দেখি অন্যদিনের মতো বিছানার পাশে পানির গ্লাসটা নেই। এলোমেলো ঘুম জড়ানো পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আরেক দফা অবাক হতে হলো। বিরাট হলঘরটায় অন্যান্য দিনে সারারাত আলো জ্বললেও আজ সেখানে অন্ধকার। বাইরে থেকে আসা আলোর ছটায় ঘরটা ছায়া ছায়া আলোআঁধারি হয়ে আছে। ফ্যানগুলো ফুল স্পিডে ঘুরছে বলে তুমুল বাতাসে চারপাশের পর্দা- টরদা সব উড়ে উড়ে বেসামাল হয়ে চলেছে দেখেও আলসেমি করে সুইচ বোর্ডের দিকে না গিয়ে আন্দাজে ঘরের কোনায় রাখা ফ্রিজের দিকে রওনা হলাম।

ফ্রিজটা খুলে পানির বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরে তাকাতেই জমে গেলাম একেবারে। ঘরের ঠিক মাঝখানে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। লিকলিকে চিকন শরীর। দুপাশে দুহাত ছড়ানো। পেছন থেকে আসা হালকা আলোয় ছড়ানো আঙুলগুলো কী শীর্ণ দেখায়! লম্বা লম্বা শণের মতো চুল মেঝেতে লুটানো সাদা শাড়ির আঁচলের সাথে মিলে হাওয়ায় উড়ে এলোমেলো হচ্ছে। আর মূর্তির নারী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সোজা।

একদম আক্ষরিক অর্থেই আমি তখন জমেই আছি। বুঝতে পারছি ঠাণ্ডা শিরশিরে ভয়ের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। বোতলটা থেকে ঠাণ্ডা পানি আঙুল গলে বেয়ে এসে জামার একটা দিক ভিজিয়ে দিচ্ছে টের পাচ্ছি কিন্তু একটা আঙুল নাড়াবার ক্ষমতা নেই কোথাও। জাদুগ্রস্তের মতো নিষ্পলকে ভূতটার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। হঠাৎ দেখি সেটা এগিয়ে আসছে এদিকেই। প্রবল চেষ্টা করেও দৌড়ে পালাবার শক্তি হাতে পায়ে আনতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সেটা এগিয়ে এসে খোনা স্বরে জিজ্ঞেস করে বসলো, কী করছ?

'ভূতটার' এগিয়ে আসা দেখেই পিলে চমকে গিয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন শুনে চটকা ভাঙল। কাছিয়ে আসা ভূতটাকে ভালোমতো ঠাহর করে দেখে নিয়ে মিনমিন করে বললাম, পানি খাচ্ছি ফুলি খালা!

ততক্ষণে মনে পড়েছে উনি আমাদের অতিথি। সেদিন সন্ধ্যায়ই গ্রাম থেকে এসেছেন। ঘুম না হওয়ায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; ওইরকম বিবাগিনী মূর্তি দেখে অন্ধকারে কেউ ভূত ভেবে বসবে এটা আন্দাজ করেন নি বোধ হয়। অবশ্য আমিও ভাবি নি উনার কল্যাণে এরকম জলজ্যান্ত ভূতের দেখা পেয়ে যাব। তবে এমন জ্যান্ত ভূতের দেখা পেয়ে যাওয়াটাও খুব মন্দ বিষয় নয়। ভূতটা 'ভূত' হিসেবে মিথ্যে হলেও ভূতের ভয়টা তো একদম সত্যিই ছিল!

অ(লৌকিক)

যাযাবর ব্যাকপ্যাকার

jajabor.backpacker@gmail.com

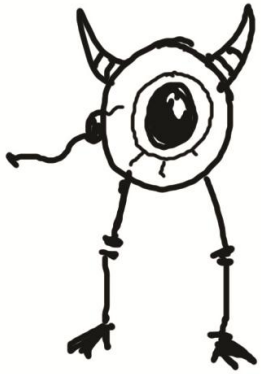

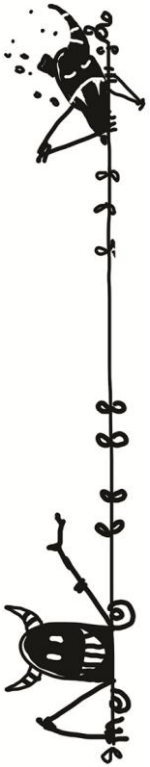

ফিজিক্সের মঞ্জু মিয়া এবারের গ্রীষ্মের ছুটির প্রায় পুরোটা বাড়িতে কাটিয়েছে। ভাগ্যক্রমে এবারের গ্রীষ্মাবকাশের আগে দিয়েই ইয়ার ফাইনাল শেষ হয়েছে, পুরো ছুটিটাই সত্যিকারের ছুটি হিসেবে পালন করবে এই নিয়তে ক্লাস শেষের দিনই ব্যাগ- বোঁচকা বেঁধে বাসে উঠে পড়েছে মঞ্জু। ছুটিটা এবার দিয়েছে দেরি করে, পুরোটা গ্রীষ্মে পড়ে নি - অর্ধেক গ্রীষ্ম, অর্ধেক বর্ষার ছুটি। দেড় মাসের ছুটির বাকি আছে আরও দিন দশেক। ইতোমধ্যে ভরা বর্ষা নেমে বিল হয়ে গেছে সমুদ্র।

মঞ্জুদের বাড়ি তাড়াশের হামকুড়িয়া গ্রামে, চলন বিলের মাঝে, সিরাজগঞ্জের সীমানায়। বর্ষায় তাদের গ্রামের বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন সব দ্বীপের মতো জেগে থাকে উথাল ঢেউয়ের নদীর বুকের মতো ভরা বিলের মাঝে। যেদিকে তাকানো যায় পানি আর পানি। সদরে তো বটেই, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবার উপায়ও নৌকা। শুকনোর দিনে তাদের বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় উঁচু উঁচু টিলার উপরে, আর নিচে সবুজ ধানক্ষেত। বর্ষাতেও বিলে ধান হয়, অদ্ভুত সে ধান, বিলের পানির সাথে সাথে বাড়তে থাকে, দশ- হাত, পনেরো- হাত উঁচু হয়ে পানির উপরে মাথা তুলে ধানের শিষ হয়, সেই ধান পাকলে নৌকা থেকেই ধান কাটা হয়।

আজকে ভরা জ্যোৎস্নার রাত। কদিন আগেই বর্ষার প্রথম ঢলটা নেমেছে। আত্রাইয়ের পানি উপচে বিলেও প্রবেশ করেছে। মিয়াবাড়ি থেকে নদী বড়জোর মাইলখানেক। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে যেন বর্ষার বিলের জলে। চারিদিকে একটা মোহময় আবেশ। বিকেলেও হুহু বাতাস ছিল, ইয়া বড় বড় ঢেউ উঠেছিল বিলের জলে, দেখে ভ্রম হয় এটাই নদী বলে। এই সময়টা এত ভালো লাগে মঞ্জুর, এর লোভেই এবার তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরা।

মঞ্জু ছাত্র ভালোই। ফিজিক্স পড়ার ইচ্ছা ছিল, অনেক খেটেখুটে প্রথমবারের চেষ্টাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। এখন তার লতিফ হলে সিট আছে, এক রুমে চারজন থাকে, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির জাকের ভাই, বোটানির শমসের, ইতিহাসের সালাম আর সে। যার যার খাটের মাথার কাছের টেবিলে বইপত্রের স্তূপ। মঞ্জুর আবার একটা আলাদা শেলফ আছে, সেখানে ডকিন্স টু হকিন্স সবার লেখা মোটা মোটা বই আছে। টাকা জমিয়ে সে এগুলা কেনে আর পড়ালেখা করে আর রাতদিন কী কী সব ভাবে আর মাথা ঝাঁকায় আপনমনেই। তাই বলে মঞ্জু যে শুধু পড়ালেখাতেই ব্যস্ত থাকে, তা তো আর না। লতিফ হলের ছাদের যে কোনায় ডাব গাছের ঝিরি ঝিরি বাতাস আসে, সেখানে বেশ ভালো একটা আড্ডা জমে প্রতি বৃহস্পতিবার মাঝরাতে হলের বস পাবলিকদের।

ছুটির আগের আড্ডায় কীভাবে যেন ভূতের গল্প শুরু হয়েছিল... পানির উপরে ভেসে ওঠা ধানের শিষ এড়াতে লগি মেরে নৌকাটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে সেই রাতে ফিরে যায় মঞ্জু।

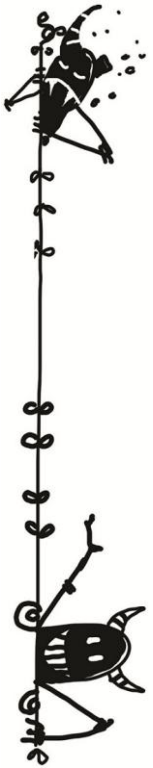

একটা বিষয় শুরু হয়ে গেলে, টপাটপ সবার সেই সম্পর্কিত গল্পগুলো বের হওয়া শুরু হয়। ম্যাথের আলি ভাই বলছিলেন ছোটবেলায় বর্ষায় কেউ ইলিশ মাছ কিনে ঘরে ফিরতে গেলেই পেছন থেকে নাকিসুরের ডাক... ছোটবেলার একটা গল্প বলছিলেন আলি ভাই, একদিন শীতের সন্ধ্যায় বাড়িতে খালি মা আর তারা ভাইবোনেরা। বাবা হাটে গিয়েছেন, ফেরেন নি তখনো। মা বাড়ির উঠোনের ছনে ছাওয়া উনুনঘরে বসে তেলেপিঠা ভাজছেন। আলি তখন ছোট, বয়স চার কি পাঁচ, আট ভাইবোন মায়ের পেছনেই গুটি মেরে বসে আছে, মা পিঠা ভাজছেন আর বড় হাতা দিয়ে বড় বড় মালপোয়া তুলতে না তুলতেই ছেলেমেয়েরা ছিনিয়ে নিচ্ছে। অনেক অনেক পিঠা আর প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবার পরে মার কেমন সন্দেহ হয়েছে, পেছনে তো ছেলেমেয়েদের আওয়াজ নেই, উঠে গেছে মনে হচ্ছে যেন সবাই। কিন্তু তাও তিনি পিঠা ভেজে তুলেই যাচ্ছেন আর সব কপাকপ নাই হয়ে যাচ্ছে! খেয়াল করে দেখলেন, গরম পিঠাওয়ালা খুন্তির দিকে বাড়ানো হাতটা কেমন সরু, ছোট আর কালো!

মা তো যা বোঝার বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি গ্রামের মানুষ, উপস্থিত বুদ্ধি হারাতে নেই, খুব জানেন। পাশে পড়ে থাকা খড়ির চুলায় ফুঁ দেবার লোহার ফুঁকনিটা উনুনে গুঁজে দেন, আবার ওদিকে নাকি আগের মতোই নির্লিপ্তভাবে পিঠা ভেজে তুলতে থাকেন। কালো, সরু, খর্বাকৃতির সেই হাতও সমানে পিঠা নিতে থাকে। তারপর ফুঁকনিটা গরমে তেতে লাল হতেই ন্যাকড়া দিয়ে ধরে এক হাতে খুন্তি দিয়ে পিঠা এগিয়ে দেবার সময়ে যেই না হাতটা পিঠার উপরে হাত দিয়েছে, অমনি গরম লোহার ছেঁকা! সাথে সাথেই তো এক পিলে চমকানো গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে কী যেন সাঁৎ করে উঠে পালিয়ে যায় উনুনঘর থেকে!

এটা শেষ হতে না হতেই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাসুদ শুরু করেছিল তার বড় ভাইয়ের অভিজ্ঞতা। গত বছরই এক কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের মাঝরাতে সামাদ ভাই আপাদমস্তক জ্যাকেট, হুডিতে মুড়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে সাতক্ষীরা সদর থেকে শ্যামনগর যাচ্ছিলেন। এমন ঘন কুয়াশা যে দুই হাত দূরের জিনিস চোখে পড়ে না। ফাঁকা ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা, দুইপাশ থেকে ঘন ঝাঁকড়া গাছ মুড়ে রেখেছে পথটাকে দুইপাশের ক্ষেত- মাঠ থেকে আলাদা করে। এক তো মাইলের পর মাইল কোনো জনমানুষ নেই, তারপরে আবার পথের ধারে গ্রামগুলোতে কোনো ঘরে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না, সবাই শীতের রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুম।

এমন সময় হঠাৎ দেখেন কোথা থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে মোটরসাইকেলের হেডলাইটটা ঢেকে দিচ্ছে, যেন এক হাত দিয়ে থামানোর চেষ্টা করছে মোটরসাইকেলকে। হাতটা রোমশ, কালো, কেমন যেন বীভৎস। মধ্যরাতে ফাঁকা রাস্তায় এরকম ঘটনা যে ঘটে, সে কথা কে না জানে!

সামাদ ভাই তো কুল- হু- আল্লাহু পড়তে শুরু করলেন। যতবার পড়েন, ততবার হাত শূন্যে মিলিয়ে যায়, আর যেই বন্ধ করেন অমনি আবার হাজির! এভাবে মাইল খানেক যাবার পরে সামনে একটা দোকানের মতো পড়ল, যেখানে আলো দেখা যাচ্ছে। সামাদ ভাই সাথে সাথে ব্রেক কষে থামলেন, পথের ধারের ছোট্ট ছাপরা দোকান, দোকানিকে সম্ভাষণের আগেই হুট করে কারেন্ট চলে গেল। চাদরে মাথা- মুখ ঢাকা দোকানি একটা টিমটিমে কুপি বাতি জ্বালালে সামাদ ভাই এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেন। প্রচণ্ড শীতর মাঝে তিনি তখন কুলকুল করে ঘামছেন। দোকানদার তার অবস্থা দেখে কী হয়েছে জানতে চাইলে, তিনি নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বয়ান করলেন। ছোকরা দোকানদার সব শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। সামাদ ভাই আরও একটু ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইলেন কী ব্যাপার। এবার দোকানদার চাদরের ভেতর থেকে নিজের হাতটা বের করে সামাদ ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "দেখেন তো, হাতটা কী এইরকম ছিলো?"

সামাদ ভাই তাকিয়ে দেখেন, সেই একই রোমশ, কালো, বীভৎস হাত!

তিনি সেখানেই জ্ঞান হারান। পরদিন জ্ঞান ফেরে শ্যামনগর থানার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। সেরাতে নাকি থানা শিক্ষা অফিসার গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন ঐ পথেই। রাস্তার মাঝে সামাদ ভাইয়ের মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখে ব্রেক

কষে গাড়ি থামায় ড্রাইভার, আরেকটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছিল! সামাদ ভাইকে পাওয়া যায় রাস্তার ধারে, একটা গাছের নিচে। সেখানে একটা ছাপরা দোকান ছিলো বটে, কিন্তু কোনো দোকানদার ছিল না।

এই গল্পের শেষে এসে ছাদের আড্ডায় সবাই চুপ করে গিয়েছিল। পরিচিত গল্প, কিন্তু তাও পরিচিত কারও সাথেই ঘটেছে, সেটা শুনলে গা কিছুটা হলেও ছমছম করে বৈকি! তাছাড়া ভুতুড়ে গল্পের জন্য পরিবেশ, পরিস্থিতি জরুরি, মাসুদের গল্প বলবার ধরনও বেশ ভালো। সে সময়ে সবারই কিছুটা হলেও নিজেদের ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ মঞ্জু শুধু সবার গল্প শুনছিল। এবার নিঃশব্দতা ভেঙে বলে ওঠে, "ভয়ের ব্যাপারটা পুরোটাই আসলে সাইকোলজিকাল। সামাদ ভাইয়ের এই ঘটনাটাই ধরা যাক। একা একা ফাঁকা রাস্তায় স্রেফ ভয় পেয়েছিলেন উনি, ঐসব হাত- টাত কিছুই ছিল না আসলে, তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন।"

মাসুদ বিরক্ত হয়ে বলে, "বাহ! আর দোকানদারের ব্যাপারটা কী তাহলে? ভাইয়া বাজি ধরে বলে যে সে পানি খেয়েছিল ঐ দোকানে।"

মঞ্জু বলেছিল, হয়ত দোকানদার আসলেই ছিল, হাতও বাড়িয়ে ধরেছিল, মজা করেই। ভাইয়া তখন এতই উত্তেজিত ছিল, স্বাভাবিক হাত দেখেই অতি-কল্পনা করে ফেলেছিলেন, স্ট্রেসড ব্রেইন নিতে পারে নি, অজ্ঞান হয়ে গেছেন। দোকানদার ভয় পেয়ে তাকে ফেলে রেখেই দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে।"

অ্যাকাউন্টিংয়ের হাসিব ভাই হেসে বলেছিলেন, "আচ্ছা মঞ্জু, তুই গ্রামের ছেলে হয়েও এসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে একটুও বিশ্বাস করিস না? তোর নিজের কোনো ভয়ের অভিজ্ঞতা নাই নাকি!"

মঞ্জুর ডিপার্টমেন্টের বন্ধু কল্লোল সরকার এবার হাসতে শুরু করেছিল, হলের বড় ভাইদেরকে বলছিল মঞ্জু কেমন ব্লগে- টগে লেখে ইদানীং সব জটিল বিষয় নিয়ে। পুরাই পচানি।

মঞ্জু চুপ করে গিয়েছিল, সচলায়তনে যে সে ইদানীং নিয়মিত ছদ্ম নিকে লেখে, বিজ্ঞান আর কবিতা, এটা বন্ধুমহলে বেশি রাষ্ট্র হওয়াটা বিশেষ পছন্দ না তার।

নৌকাতে বসে পানিতে চাঁদ আর জোছনার ছায়া দেখতে দেখতে এইসব কথা মনে পড়ার কারণ হিসেবে মঞ্জুর মনে হয় আজকে সন্ধ্যার ঘটনাই দায়ী। বিকেলে রোদ পড়তেই যেই ঝড়ো হাওয়া উঠল, টুক করে ছোট নৌকাটা নিয়ে বাড়ির সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছে মঞ্জু মিয়া। একা একা বড় বড় ঢেউগুলো পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার দিকে শেখেরটেক দক্ষিণ ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখে একটা ছোটখাটো ভিড়। কৌতূহলী হয়ে আর একটু আগানোর পরে জানতে পারে রইসুদ্দী শেখকে কে বা কারা যেন খুন করেছে কালকে রাতে। কালকে বিকেলে সিরাজগঞ্জ শহরে গিয়েছিল রইস শেখ, জমিজমার একটা কেসের কাজে। সারারাতেও বাড়ি না ফেরায় চিন্তায় পড়ে যায় বাড়ির লোকে। মাঝবয়সি রইস শেখ শেখেরটেকের পুরাতন শেখ বাড়ির ছেলে। বাপ- দাদার জমি- জিরাতের কাজ বাদ দিয়ে মাছের চাষ শুরু করেছিল। বেশ ভালো লাভ হবার পরে গত ক'বছরে নিজেদের বন্ধকি আবাদি জমিজমা ফিরিয়ে নিতেও শুরু করেছিল আমবাড়িয়ার মোল্লাদের থেকে। দেখে নাকি মনে হচ্ছে কেউ মাথার পেছনে বাড়ি মেরেছিল।

পরিচিত কেউই হবে, নাহলে নৌকা থামিয়ে নৌকায় উঠে মারল কী করে! মনে মনে ভাবছিল মঞ্জু। ঐখানে কিছু না বলে সরে আসে দূরে। নিজেদের গ্রাম হামকুড়িয়া থেকে একটু বেশিই দূরে সরে এসেছে আজকে। ফিরতি পথ ধরে। আমবাড়িয়ার দক্ষিণ ঘাট থেকে এগোতেই ছেলেদের একটা দলের সাথে দেখা হয়। নৌকা নিয়ে বেড়িয়েছে সব আষাঢ়ের প্রথম ঢলে নদী থেকে ভেসে আসা মাছ ধরতে মহা ধুমধামে। ততক্ষণে সাঁঝ নেমে এসেছে, পশ্চিমাকাশ ঘন লাল, হাসান- হোসেনের রক্তের মতো, দাদীর বলা ছোটকালের গল্প মনে পড়ে মঞ্জুর।

তখনো বিল বেশ উত্তাল। একসময়ে তিন গাঁয়ের ছেলেরা একসাথে বর্ষায় নৌকা বেয়ে গেছে তিন মাইল দূরের স্কুলে পড়তে। অনেকেই হই হই করে উঠল তাকে দেখে, কিন্তু আজকে উত্তাল বিলে নৌকা বেয়ে ক্লান্ত মঞ্জু, ওদের সাথে খানিকক্ষণ ঠাট্টা মশকরা করে ফিরতি পথ ধরে।

কিন্তু নৌকাগুলো থেকে সরে আসতেই আমবাড়িয়া আর শেখেরটেকের মাঝের একটা বাঁকে মাছটা চোখে পড়ে মঞ্জুর। বিশাল একটা বোয়াল। খাবি খাচ্ছে পাড়ের কম পানির একটা জায়গায় আটকা পড়ে। নৌকা কাছে আসতেই ঘাই মেরে লাফিয়ে ওঠে বোয়ালটা। মঞ্জু নৌকা আর একটু আগায়। আবার

লাফিয়ে ওঠে মাছটা। এবার এত উঁচুতে যে নৌকার কিনারা ছাড়িয়ে উঠে পড়ে উঁচুতে, পুরো এসে পড়ে মঞ্জুর বাড়ানো হাতের মাঝে, যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এভাবে বিনাকষ্টে এত বড় মাছ ধরার কথা ভাবে নি মঞ্জু, মনে হয় আশেপাশের কারও মাছের ঘেরে বানের পানি ঢুকে ভেসে এসেছে। পেয়েই যখন গেছে, সেটাকে নামিয়ে দেয় নৌকার পাটাতনের বাঁশের চাড়ার[১] একটা অংশ তুলে নৌকার তলায়, থাকুক ঐখানে, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত। মাছটা গলুইতে জমে থাকা অল্প পানিতে খাবি খায় খানিকক্ষণ, ধাক্কা দেয় নৌকার গায়ে, কিন্তু সুবিধা করতে পারে না।

নাটোর- সিরাজগঞ্জের হাইওয়েটা দেখা যায় বিলের এই অংশ থেকে। টোলের রাস্তা থেকে বিলের মাঝে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, গ্রামগুলো সব দ্বীপ- দ্বীপ। রাস্তা দিয়ে হুশহাশ ট্রাক- বাস- গাড়ি চলে যাচ্ছে। আর সব শান্ত, শুনশান, জোছনার আলোতে চকচক করছে। ঝড়ো বাতাস শান্ত হয়েছে এতক্ষণে। মাঝদরিয়ার মতো বড় বড় ঢেউগুলো কমে এসেছে। বিলের পানির উপরে মাথাচাড়া দেয়া ধানের ক্ষেতকে এড়িয়ে লগি ঠেলে এগোয় মঞ্জু মিয়া। আর তখনই হুট করে সেদিনের ভূতের আড্ডার গল্পের কথা মনে পড়ে যায়।

চাড়ার তলায় মাছটার সাড়া পাওয়া যায়, ঘাই মারছে তখনো। মাছটা যেন অনেক অস্থির হয়ে আছে, তাই মনে হয় মঞ্জুর।

"চুপ করে থাক্! আর ঘণ্টাখানেক পরেই বাড়ি পৌঁছাবো," অনেকটা আপনমনেই মাছটাকে বা নিজেকেই বলে মঞ্জু মিয়া।

"মোল্লা বাড়িত নামায়ে দিবা?"

চমকে ওঠে মঞ্জু।

কেউ একজন পাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে। এখনো আমবাড়িয়া ছেড়ে সরে আসে নি বেশি দূর মঞ্জুর নৌকা।

ঘোর ভাঙে মঞ্জুর। আশেপাশে আর কেউ নেই, সব শুনশান। পাড় থেকে বেশ দূরে থাকা মঞ্জুকেই বলেছে, কিন্তু বলেছে খুব নিচু স্বরে। বাতাসে ভেসে এসেছে তার আওয়াজ, কেমন যেন হিসহিসিয়ে, অস্বস্তিকর।

কী মনে করে চলে যেতে গিয়েও তীরের কাছে নৌকা নেয় মঞ্জু মিয়া, ঐ পথেই তো ফিরবে। আর আশেপাশের গ্রামেরই কেউ হবে, না নিলে পরে দুর্নাম করবে তার বাপ- মায়ের কাছে। নৌকাটা কাছে নিতেই লোকটা লম্বা পা ফেলে একলাফে উঠে পড়ে নৌকায়।

সামান্য ঠাণ্ডা লাগে মঞ্জুর। মনে হয় বৃষ্টি- বাদলা হবে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ভাবে মঞ্জু।

উঠেই ছোট নৌকার অন্য মাথায় বসে পড়ে লোকটা চুপ করে। কেমন একটা অস্বস্তি হয় মঞ্জুর। লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত। মাথাটাথা কালো একটা চাদর মুড়ানো এই গরমের রাতেও। মুখটা ছায়া হয়ে আছে, শুধু চোখটা দেখতে পেয়েছে একবার, কেমন লাল লাল চোখ, যেন গাঁজা টাজা টেনেছে। এই বর্ষাকালে চাদরমুড়ি কেন এইরকমের! অবশ্য ঠাণ্ডা একটা ভাব আছে, হয়ত লোকটার জ্বর, এই জন্যেই চোখ লাল আর গলার স্বর ঐরকম।

লোকটার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চেপে যায় মঞ্জু। কলেজ জীবন থেকে গ্রামছাড়া, সেভাবে সবাইকে মনেও নেই। কিন্তু হামকুড়িয়ার মিয়াবাড়ির ছোট ছেলে মঞ্জুকে তো আশেপাশের আর পাঁচটা গ্রামের প্রায় সবাই চেনে। আর এইরকম একটা পাগলা কিসিমের লোকের সাথে বেশি কথা বলার দরকারটা কী! তারচেয়ে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যাওয়া ভালো।

খেয়াল করে, লোকটা উঠতেই কেমন চুপ করে গেছে গলুইয়ের মাছটা। যাক, ক্লান্ত হয়ে গেছে মনে হয়, তার মতোই। এখন চুপ করে থাকুক সে বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত।

লগি ঠেলে আবার ক্ষেতের থেকে সরিয়ে আনে নৌকাটা, ধান বাঁচিয়ে পানিতে নিয়ে ফেলে। কী দারুণ জোছনা! যেন চাঁদের আলোর বান ডেকেছে, বানের জলে ভাসা বিলে। এইরকম জোছনা নিয়েও সেদিন কী যেন একটা গল্প বলেছিল কেউ। তাদের গ্রামের আমবাগান লাগোয়া কবরস্থান। দুইয়ের মাঝখানে একটা প্রাচীন শ্যাওড়া গাছ আছে নাকি। সে গাছের অনেক দোষ, (নামটাই তার মধ্যে অন্যতম, মনে মনে হাসে মঞ্জু এই এখন মনে পড়াতেও)। ছেলেটা বলছিল ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল স্কুলের এক শহুরে বন্ধু। ভোরে উঠে আম কুড়ানোর কথা। বাজি লেগেছে কে আগে গিয়ে বেশি কুড়িয়ে আনতে পারে। বন্ধুর ঘুম ভেঙেছে সবার আগে। বাইরে তাকিয়ে দেখে আলোতে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। বেলা বেশি হয়ে গেছে ভেবে দুদ্দাড় দোর খুলে বেরিয়ে গেছে বাইরে। সোজা আমবাগানে। গিয়ে দেখে গাছের নিচে সব কাঁচা- পাকা আম পড়ে আছে, শয়ে শয়ে। আর বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আম কুড়াচ্ছে। সেও মহানন্দে আম কুড়াতে শুরু করেছে।

কুড়াতে কুড়াতে কী মনে হতে খেয়াল করে দেখে প্রায় কবরস্থানের কাছে চলে এসেছে। একটু ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে ছেলেমেয়েগুলো সবাই কেমন চাদর মুড়ি দেয়া, এই গরমের দিনেও। কেমন অস্বস্তি হওয়ায় সে পাশের মেয়েটাকে বলেছে, আপা, আপনি কি অমুকদের বাড়ির?

মেয়েটা মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছেলেটা। নাকি সেখানে কোনো মুখ ছিল না, খালি ভয়ঙ্কর এক শূন্যতা!

ভোরে তাকে পাওয়া যায় বাড়ির দাওয়ায়। সে যখন বাইরে বেড়িয়েছিল সেটা ছিল রাত দুইটার মতো! চারিদিক ভেসে যাচ্ছিল চাঁদের আলোয়, দিনের না!

নিজের অজান্তেই মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হালকা শিহরণ খেলে যায় মঞ্জু মিয়ার। ধুর! কী সব আউল ফাউল চিন্তা! সন্ধ্যা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলোই এইসব চিন্তা মাথায় নিয়ে আসছে বারবার। ভয়টয় সব মনের ব্যাপার। অতিপ্রাকৃত বলে কিছুই নেই। সবকিছুই সায়েন্স ব্যাখ্যা করতে পারে। মানুষ এখন যা জানে না, ব্যাখ্যা করতে পারে না, সেটাই জ্বীন- ভূতের ঘাড়ে চাপায়। নিজেকে বুঝ দেয় মঞ্জু।

ঐ যে মোল্লাবাড়ির ডাব গাছের সারি দেখা যায় আবছা আলোয়। পাড়ে নৌকা লাগায় মঞ্জু। লোকটাকে বলে নামতে।

নামার সময়ে লোকটার মাথা থেকে চাদর সরে যায়। মাথায় কেমন যেন উসকোখুসকো চুল। চোখগুলো যেন আরও লাল দেখাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায় মঞ্জু মিয়া।

শেখেরটেকের রইস শেখ তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'ধন্যবাদ, মিয়াবাড়ির গ্যাদা[২]।'

পরদিন ভোরে যখন জ্ঞান ফেরে ফিজিক্সের মঞ্জু মিয়ার, দেখে বাড়ির উঠোনে মাথায় পানি দিচ্ছে মা। ফজরের নামাজ পড়ে আসা বাবা, মাথায় তখনো টুপি পরে, খানিক দূরে দাঁড়িয়ে মাকেই বকাঝকা করছে, ছেলেকে শাসনে রাখতে পারে না, রাত- বিরাতে অজায়গা- কুজায়গায় নৌকা নিয়া ঘুরে বেড়ায়, এইসব বলছে।

মায়ের পাশে ছোট চাচী, আর তার কোলের পাশে পাঁচ বছরের চাচাতো বোন মৌরী।

মঞ্জু চোখ মেলে উঠে বসলে, মা চোখ মুছতে মুছতে ছোট চাচীকে তার প্রতি খেয়াল রাখতে বলে নিজে রান্নাঘরের দিকে যায়, বাড়ির সবার নাশতা দেখতে।

বাড়িতে আরও অনেক মানুষ, টের পায় মঞ্জু। সবাই তাকে নিয়েও ব্যস্ত না। কিছু একটা হয়েছে, তা নিয়ে উত্তেজিত। বাবা আর মেজো চাচা জটলা করছে

গ্রামের আর মুরুব্বিদের সাথে। সেখান থেকে ‘মোল্লা বাড়ি’ আর তাদের ছোট ছেলে ‘জসীম মোল্লা’র নাম ভেসে আসে মঞ্জুর কানে। পাশ দিয়ে বড় চাচাতো ভাই মালেক বেরিয়ে যেতে লাগলে হাত বাড়িয়ে তাকে থামায় মঞ্জু।

মালেক জানায় তাকে ভোর রাতে পাওয়া গেছে বাড়ির কাছেই, নৌকাতে অজ্ঞান অবস্থায়। মাছের কথা জানতে চাইলে বলে কোনো মাছ- টাছ ছিল না কোথাও।

আরও জানায় কালকে রাত থেকে আমবাড়িয়ার জসীম মোল্লাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে গুজব আগের রাতে খুন হওয়া শেখেরটেকের রইস শেখের সাথে জসীম মোল্লার শত্রুতা চলছিল জমিজিরাত নিয়ে অনেকদিন ধরেই।

মালেক পুরাটা শেষ করার আগেই আবার জ্ঞান হারায় ফিজিক্সের মঞ্জু মিয়া।

.....

[১] চাড়া - আঞ্চলিক ভাষায় নৌকার উপরে বাঁশের পাটাতন।

[২] গ্যাদা - আঞ্চলিক ভাষায় ‘ছেলে’, ‘বেটা’।

ভূতানুভূতি

চরম উদাস

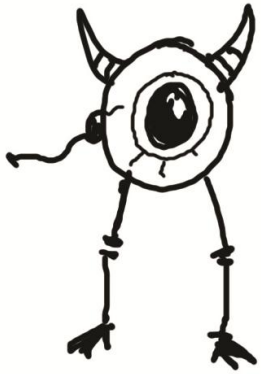

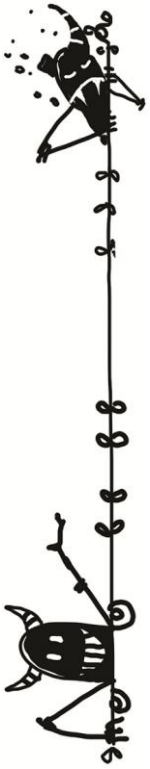

দৈনিক ভূতবার্তায় মদনা ভূতের লেখা একটা কলাম নিয়ে শুরু হয়েছে বিশাল হৈচৈ।

"এই যে তৃতীয় পৃষ্ঠার ষষ্ঠ লাইনে মদনা ভূত লিখেছে, পত্নীরা মরে গেলে পেত্নী হয়। এটা কোনো কথা হলো? পত্নীর সাথে পেত্নীদের সম্পর্ক কোথায়? পেত্নীরা কি পত্নীদের মতো অত্যাচারী না নিষ্ঠুর? আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মদনা ভূতের ফাঁসি চাই।"

এক দমে নাকি গলায় খ্যানখ্যান করে বলে গেল মুন্নি শাঁকচুন্নি।

মদনা ভূত এক কোনায় কাঁচুমাচু হয়ে দাড়িয়ে ছিল। মিনমিন করে বলল, "ফাঁসির পরেই তো আমি ভূত হলাম। ভূত হিসেবে আবার ফাঁসি দিলে কি আমি আবার মানুষ হবো?"

জ্ঞানী ভূত আবু ইউসুফ মদনার কথা শুনে ক্ষেপে গেল। প্রকৌশলবিদ্যা পাঠরত অবস্থায় আবু ইউসুফের মৃত্যু হয় জ্ঞানের চাপে ঘিলু ফেটে। অজ্ঞানের কোনো কথা সে সহ্য করতে পারে না।

"ওই ব্যাটা অশিক্ষিত, এইটা কি ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন[১] পাইছস নাকি যে টাইম ডোমেইনে লাথি মারলে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যাবি, আবার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে লাথি মারলে টাইম ডোমেইনে ফিরা আসবি।"

মামদো মতিন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

"এই বিষয়টা পরিষ্কার করা দরকার। মানুষ মরলে ভূত হয়, কিন্তু ভূত মরলে মানুষ হয় না। ভূত মরলে ভূভূত হয়। মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, তেমনি আমরা ভূতরা ভূভূতকে ভয় পাই। আবার ভূভূত মরলে হয় ভূভূভূত। ভূভূতরা আবার ভূভূভূতকে ভয় পায়। একইভাবে ভূভূভূত মরলে হয়..."

আবু ইউসুফ মামদো মতিনকে থামিয়ে আবার জ্ঞান দেয়,

"মনে কর তুই N- সংখ্যক বার মরলি, তাইলে তুই হবি গিয়া ভূ টু দি পাওয়ার N-1 ভূত। আর অনেকের মধ্যেই এই ভুল ধারণাটা আছে যে মানুষ হচ্ছে টাইম ডোমেইন আর ভূতরা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।"

মদনা আগা মাথা কিছু না বুঝেই প্রাণপণে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে যায়।

মামদো মতিন আবার বলে,

"মদনা তোরে ফাঁসি দিয়েছিলো জানি কী কারণে?"

"মহিলাদের নিয়ে রসিকতা করে একটা কৌতুক লিখছিলাম পত্রিকায়। রমনা রমণীয় রমণী সংঘ আমার নামে মামলা ঠুকে দিলো আদালতে। রমণানুভূতিতে আঘাত লেগেছে এই বলে। বিচার- আচার করে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলায়ে দিয়ে দিলো।"

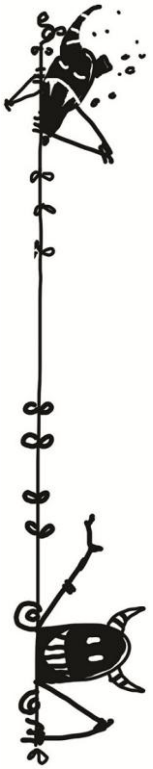

"তারপরও তোর শিক্ষা হইল না? তুই কি জানিস না মহিলারা তাও অল্পবিস্তর রসিকতা সহ্য করতে পারে, কিন্তু পেত্নীসমাজে রসিকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তুই কোন সাহসে পেত্নীদের পেত্নানুভূতিতে আঘাত করলি?"

প্রতি শনিবার শ্যাওড়াতলায় এই ভূতকোর্ট বসে মামদো মতিনের নেতৃত্বে। অন্য সময় মুরুব্বি ভূতেরা শ্যাওড়াতলায় বসে পান তামুক খায় আর বখে যাওয়া তরুণ ভূত সমাজ নিয়ে হাপিত্যেশ করে। শনিবার সন্ধ্যায় সবাই এক হয়, সারা সপ্তাহের বিচার আচার হয়। সবার বিচার শোনার পর মুরুব্বি ভূতেরা রায় দেয়।

সত্যানন্দ মালাকার আর ভূতানন্দ মালাকার ভূত সমাজের দুই প্রধান কবি। দুজনের শেষ নাম এক আর দুজনেই বেশ গোলাকার, এ ছাড়া তাদের মাঝে কোনোই মিল নেই। বরং একে অন্যের দুচোখের বিষ। ছন্দের জাদুকর বলে পরিচিত সত্যানন্দের ধ্যান জ্ঞান সবই ছন্দ। নিজের নাম নিয়ে সে কালজয়ী পদ্য রচনা করেছিল,

মালাকার গোলাকার
কিম্ভূত কিমাকার
অদ্ভুত ছড়াকার
কালজয়ী কলাকার

ভূতানন্দ আসার আগে সব নবীন কবিরা সত্যানন্দের মতো করেই ছন্দ মিলিয়ে পদ্য লিখার চেষ্টা করতো। ভূতানন্দ এসে পদ্যের নতুন নিয়ম তৈরি করে। ঘোষণা দেয়, ছন্দের দিন শেষ এখন ভূন্দ দিয়ে পদ্য লিখতে হবে। সত্যানন্দের কালজয়ী মালাকার কবিতাকে সে ভেঙেচুরে নতুন করে ভূন্দ দিয়ে লিখে ফেলে।

মালাকার গোলগাল
কিম্ভূত দেখতে
আজব সে কবি
করে শুধু চিৎকার।

ভূন্দে কোনো ছন্দের মিল নেই বললেই চলে। শুধু পদ্যের প্রথম আর শেষ শব্দে মিল হয় আর বাকি সব জায়গায় গরমিল থাকা আবশ্যক। সত্যানন্দ ভূতানন্দের ধৃষ্টতায় হতভম্ব হয়ে যায় প্রথমে। পরে সামলে নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ভূন্দ নিষিদ্ধ করার আবেদন জানায়। কিন্তু প্রায় সব তরুণ কবিরাই ছন্দ ফেলে ভূন্দ নিয়ে বেশি আগ্রহী হয়। এতে কষ্ট কম। হাবিজাবি একটা কিছু লিখে শুরু আর শেষটা মিলিয়ে দিলেই দিব্যি পদ্য হয়ে যায়।

সত্যানন্দ তার পদ্যের বাজার খারাপ দেখে এবার নতুন প্যাঁচ কষে। বলে পদ্যে আসলে শব্দের কোনো মূল্য নেই। খটমট শব্দ পড়ে এমনিতেও বেশিরভাগ লোকেই মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না। তাই শব্দ বাদ দিয়ে শুধু ছন্দ দিয়ে কবিতা লিখতে হবে। শব্দ নয় ছন্দই হবে কবিতার ভাষা। যেমন,

ভূভূ তুতু ভূতুতুতু ভূতুতুতু
ভূ তু ভূ তু তুতু ভূভূ
ভূভূ ভূভূ তুতু তুতু

এইখানে টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতো করে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হয়। এইরকম শুধু ভূ আর তু কে সম্বল করে ভূতানন্দ হাজার পাতার মহাকাব্য লিখে ফেললো এবং সেই সাথে আবার তরুণ কবিদের শ্রদ্ধা কিছুটা হলেও ফিরে পেলো।

এমনিতে দুই কবি একে অপরের ছায়া মাড়ায় না। কিন্তু দুজনেই আজ এক হয়ে মদনা ভূতের বিরুদ্ধে বিচার নিয়ে এসেছে। মদনা নাকি কবিতা নিয়ে আজেবাজে কথা বলে তাদের কবিনুভূতিতে আঘাত করেছে।

"মদনা তাঁর লেখায় বলেছে আমি নাকি সফটওয়্যার দিয়ে ছন্দ মিলাই।"

ফোঁসফোঁস করতে করতে বিচার দেয় সত্যানন্দ। মদনা আবার মিনমিন করে বলে,

"ভুলটা কী বললাম? আমি নিজ চোখে দেখেছি ও তাল লিখে তার নিচে কাল, খাল, গাল থেকে শুরু করে চন্দ্রবিন্দু আকার ল পর্যন্ত সব শব্দের একটা লিস্টি বানায় সফটওয়্যার দিয়ে। তারপর কী জানি একটা কস্কি লোশন না কী জানি করে মিলিয়ে দেখে কোন শব্দটা সবচেয়ে জুতসই।"

জ্ঞানী ইউসুফ ভূত ধরতে পারে ব্যাপারটা,

"ক্রস কো- রিলেশন[২] করে! খাইছে আমারে!"

এবারে ভূতানন্দও বিচার দেয়,

"মদনা আমার আবিষ্কার করা ভূন্দ নিয়েও আজেবাজে কথা বলেছে। ভূন্দের পুরা মানে নাকি ভুদাইদের ছন্দ। কত বড় বেয়াদ্দব।"

জীবনে প্রথমবারের মতো সত্যানন্দ আর ভূতানন্দ একসাথে গলা মেলায়,

"আমরা আমাদের কবিনুভূতিতে আঘাতের বিচার চাই।"

খিলখিল খলিল ভূত খেলাধুলা বিশেষজ্ঞ। ভূত সমাজের স্পোর্টস রিপোর্টার এবং সেইসাথে সাপ্তাহিক খেলারাম খেলে যা পত্রিকার সম্পাদক। মদনা তাকেও খেপিয়েছে। তার নামে লিখেছে খেলারাম নাকি আসলে খেলাধুলার কিছুই বোঝে না আর বিদেশি ভূতেদের লেখা কপি করে রিপোর্ট লিখে। সে- ও তাই বিচার নিয়ে এসেছে মদনা ভূতের বিরুদ্ধে। মদনা নাকি তাঁর সাংবাদিকানুভূতিতে আঘাত করেছে। সেইসাথে ডাক্তার স্কন্ধকাটা কামরুল এসেছে ডাক্তারানুভূতিতে আঘাতের বিচার চাইতে, প্রকৌশলী ব্রহ্ম বদরুল এসেছে ইঞ্জিনিয়ারানুভূতিতে আঘাতের বিচার চাইতে। মদনা নাকি তাদের যথাক্রমে হাতুড়ে ও ঘুষখোর বলেছে।

মদনা এবারে একটু ক্ষেপে যায়,

"ফাইজলামির একটা সীমা থাকা উচিত। আজকে এর এই অনুভূতি ব্যথা পায় তো কালকে ওর ওই অনুভূতি ব্যথা পায়। আমরাও মানব সমাজের মতো বেকুব প্রজাতি নাকি? আবার সব মুরুব্বিরা সং সেজে বসছে বিচার করতে। এখন তো আবার মুরুব্বি ভূতেরা বলবেন তাদের বিচারকানুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলছি।"

বিচারক মুরুব্বি ভূতেরা এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। সবাই বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যায়। দুই তিনজন একসাথে গুনগুন করেন, ভূতকোর্টের অবমাননা করা হয়েছে।

বিচারের রায়ে পেত্নানুভূতি, কবিনুভূতি, সাংবাদিকানুভূতি, ভূতকোর্টানুভূতি সহ নানা ধরনের অনুভূতিতে আঘাত করার অপরাধে মদনার ফাঁসি হয়ে গেল।

ফাঁসির আগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদনা বলল, বেকুব ভূত সমাজ। সব অনুভূতিই আছে খালি ভূতানুভূতিটাই নাই।

.....

[১] ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন (Fourier transformation): কোনো সিগন্যালকে সময়ের সাপেক্ষ থেকে রূপান্তর করে কম্পাঙ্কের সাপেক্ষে দেখানোর পদ্ধতি।*

[২] ক্রস কো- রিলেশন (Cross correlation): দুটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গাণিতিক পরিমাপ।*

** বিস্তারিত জানতে Google- এ চিপি দিন।*

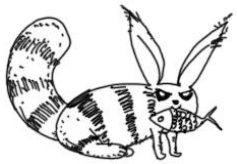

যে রাতে ওনার সাথে দেখা হলো

ওডিন

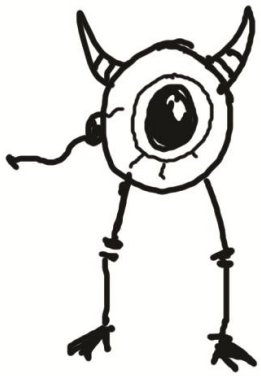

পাঠপূর্ব কথাবার্তা:

আমি একজন পারফেক্ট ব্লগার। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া আমি বানিয়ে বানিয়ে কিছু লিখতে পারি না। তাই ভূতের গপ্পো লেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। ভাবলাম অনেককে অনেকবার অনেকভাবে বলা আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাকেই লিখে ফেলি। যদিও আমার ধারণা অন্যরকম, কিন্তু আমার সাথে যে ছিল তার আজও বদ্ধমূল ধারণা যে এইটা একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার! যাই হোক, প্রিয় পাঠক, বিচারের ভার আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। সকল ঘটনা ও চরিত্র বাস্তব। আমি শুধু প্রাইভেসি রক্ষার্থে নামধাম বদলে দিয়েছি।

একবার কল্পনা করুন দৃশ্যটা। রাত দশটা। বনানী। কাকলী রেল ক্রসিং। ছাব্বিশে ডিসেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন নিঝুম রাত। কয়েকদিন আগের ঈদ আর আগের দিনের ক্রিসমাসের ছুটির রেশ শহরটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বিশাল রাস্তাটায় জনমনিষ্যি নেই বলতে গেলে। সব লোকজন ঘরে, কাঁথাকম্বলে মুড়িয়ে ঘরে টিভি সিরিয়াল বা রাজনৈতিক টকশো দেখছে। শুধু কয়েকজন পুলিশ একেবারে আর্কটিক গিয়ারের মতো হুডওয়ালা জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ি হুশ করে ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির টেইল লাইট, দোকানপাটের আলো আর ট্রাফিক সিগন্যাল। এর সাথে যোগ হওয়া কুয়াশা। কুয়াশা আবার সবদিকে যাকে বলে ইউনিফর্ম না। একটা বড় কাচের বাটিতে চিকেন কর্ন স্যুপ ঢেলে ওইটার ভেতর দিয়ে টিভির বাংলালিংকের অ্যাড দেখার চেষ্টা করলে যেরকম ঘোলাটে সব রংচঙে দৃশ্যাবলী দেখা যাওয়ার কথা - ঠিক সেইরকম ব্যাপারটা।

এই ঝাপসা আলোআঁধারির মাঝেই দুইটা ছায়া বনানী ডিওএইচএস- এর মোড়ের দিক থেকে হেঁটে আসছিল। একটা ছায়া একটু মোটাসোটা, লম্বা, কাঁধে উঁচু কুঁজের মতন কী জানি একটা। আরেকটা ছায়া প্রথমটার মতনই লম্বা, তবে সাইজে প্রথমের প্রায় দেড়গুণ! মুখের কাছে আবার কমলা আগুন জ্বলজ্বল করছে। বেশ ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে ছায়া দুটো।

ল্যাম্পপোস্টের ঘোলাটে আলোর বৃত্তের নিচে আসতে ছায়া দুটোকে ভালোমতো দেখা গেলো। একটু কম মোটা আর কাঁধে ঝোলাওয়ালা ছায়াটা আর কেউ না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই অধম। অকেশনাল ব্লগার, পার্টটাইম অর্থোপেডিক সার্জন, ফুল টাইম বাউণ্ডুলে। আর অন্যজন আমারই বাল্যবন্ধু ফরহাত*। আমার কাঁধে ব্যাকপ্যাকের ওপরেই একটা শাল জড়ানো ছিল, তাই সেটাকে দেখলে দূর থেকে কুঁজ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তারপরে আবার শীতের কামড় থেকে বাঁচার জন্য আধহাত ঘোমটা টেনে দিয়েছি। ফরহাত সোয়েটার পরা থাকলেও এর ওপরে জড়িয়েছে ওর মা'র একটা এমব্রয়ডারি করা শাল। নিচে পরে আছে অনেক পকেটওয়ালা থ্রি- কোয়ার্টার কার্গো শর্টস। ঠোঁটে সিগারেট। আর সবচে' বড় ব্যাপার হলো সে বেশ মোটা একটা ছেলে। মানে, বে- এ- এ- শ মোটা একটা ছেলে। যতটুকু মোটা হলে আদর করে 'মোটকু ছেলে' বলা যায়

তার থেকেও বেশি মোটা একটা ছেলে ও। তাই ওকে দেখতে আমার থেকে কম বিদঘুটে দেখাচ্ছিল না।

ছুটির দিন কাটাতে গেছিলাম সক্কালবেলাতেই ফরহাতদের ডিওএইচ-এসের বাসায়। কিছু গান কপি করলাম। গেমস খেললাম। আড্ডা দিলাম। কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে খেয়াল করি নাই। যখন হুঁশ হলো, এই শীতের রাতে বাসায় ঢুকতে না দিলে কী হবে এইটা ভেবে তাত্তাড়ি দৌড় দিলাম। পোস্ট- ঈদ পিরিয়ড বলে রাস্তায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অনেক কম। আর শীতও প্রচণ্ড। তাই ফরহাত আমাকে এগিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। আমাকে কোনো একটা বাস (বা খুব সৌভাগ্যবান হলে একটা সিএনজি অটোরিকশায়) তুলে দেবে। তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর আসল প্ল্যান হচ্ছে ওর ক্রমক্ষয়িষ্ণু সিগারেটের সংগ্রহকে আর একটু সমৃদ্ধ করা।

তো, নিঝুম শীতের রাত। আমরা দুইজন হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনের ওপর চলে এসেছি। লাইনদুটো বেশ গরম। একটু আগে একটা ট্রেইন গেছে মনে হয়। আমি লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া ট্রেইনের কম্পন বোঝার চেষ্টা করছি, ফরহাত গেছে একটু পাশেই সিগারেটওয়ালা মামুর কাছে দোকানে। তার আজ রাতের নিকোটিন ডোজ, দুই প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেইজেস লাইটস- এর দরদাম করতে। আমি ভাবছিলাম, সিগারেটওয়ালা ফরহাতকে ডাকে মামু, ফরহাতও সিগারেটওয়ালাকে ডাকে মামু, কী প্যাঁচালো নিকোটিন- টাকা- স্নেহের একটা গোলমেলে সম্পর্ক।

এই সময় ঘটনাটা ঘটলো।

একটা কালো কাচে ঢাকা জানালার ততোধিক কালো টয়োটা এসইউভি (মানে সোজা বাংলায় যাকে আমরা বলি 'জীপ', যেরকম আমাদের কাছে সব মোটরবাইকই হলো 'হোন্ডা') প্রায় নিঃশব্দে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। পেছনের দিকের জানালার কাচ সরসর করে নেমে গেল। আর উঁকি দিলো একটা মুখ। মাঝবয়সি। কালো কোঁকড়া চুল। উজ্জ্বল চোখ। গোঁফ আছে। আমার মনে পড়ে গেল স্টার স্পোর্টসে দেখা মেক্সিকোর ষাঁড়ের লড়াইয়ের বয়স্ক ম্যাটাডোরদের কথা। অথবা আপনারা যারা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বইটা পড়েছেন, তাদের জন্য আরও ভালো একটা রেফারেন্স - কোঁকড়াচুলো গুঁফো মাস্কেটিয়ার 'আথোস'- এর কথা। (আমি অবশ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স- এর কোনো সিনেমা দেখি নাই, একটা কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি ভেবে নিলাম আর কি। আপনারাও ভেবে নেন একটু কষ্ট করে।)

গাড়ির ভেতর থেকে মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো-

"আসসালামু আলাইকুম। আমি হায়দার কামিজ*"

সুপ্রিয় পাঠক!

কী করবেন আপনি - যখন আপনি হিমশীতল কুয়াশাচ্ছন্ন আলোআঁধারি রাতে কাকলি রেইল ক্রসিংয়ের ওপর আপনমনে রেললাইনের ওপর পা রেখে দূরবর্তী ট্রেইনের কম্পন অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় জাতীয় ফুটবল দলের একজন প্রাক্তন অধিনায়ক, আপনার প্রিয় ফুটবল ক্লাব আবাহনীর আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহামেডানের প্রাক্তন অধিনায়ক, কালো টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারের ভেতর থেকে আপনাকে বলে "আসসালামু আলাইকুম। আমি হায়দার কামিজ"?

ভাবলাম ভদ্রলোককে একেবারে বেমালুম উপেক্ষা করি। এমনিতেই মা সবসময় বলেছেন অপরিচিত লোকজনের সাথে রাস্তাঘাটে কথা না বলতে। আর ওরা গাড়িতে থাকলে তো এক্কেবারে নৈবচ। নিশ্চিত ছেলেধরা। ধরতে পারলেই আপকামিং পদ্মা সেতুর পিলারের মধ্যে গেঁথে দেবে। পিলারে মানুষজন আটকে রাখলে নাকি ব্রিজের স্থায়িত্ব বাড়ে।

একবার ভাবলাম বলি, ইয়ে মানে আঙ্কেল, আমি আবাহনীর সাপোর্টার। একেবারে যাকে বলে পাঁড় সমর্থক, ফ্যানাটিক ফ্যান।

আবার ভাবলাম নাকের ওপর একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই, আবাহনীর বিপক্ষে ব্যাটা যে কয়টা গোলটোল করেছে, ওইগুলোর প্রতিশোধ হিসেবে। (যেকোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিশীল লোক আমার সাথে একমত হবেন, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিশীল লোকজনই আবাহনীর সাপোর্টার)। কিন্তু এরপর আমার মনে হলো, ভদ্রলোক 'জাতীয় ফুটবল দল'- এর একজন 'প্রাক্তন অধিনায়ক।'

এখন এইখানে ঘটনা হইলো আমি অনেক সেলিব্রেটিদেরকেই চিনি, কিন্তু তার মধ্যে জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়কের পর্যায়ে পড়ে, এমন লোকের সংখ্যা মাত্র দুইজন। একজন জাতীয় খোখো টিমের ফর্মার ক্যাপ্টেন, আরেকজন জাতীয় বাস্কেটবল টিমের ফর্মার ক্যাপ্টেন। এখন খোখো আর বাস্কেটবল, ফুটবলের ধারেকাছেরও কিছু না। ইনফ্যাক্ট ওই দুইটা তো কোনো খেলাই না! তারপরেও আমার মনে হলো আসলে আমি অনেকদিন ফুটবল- বিচ্ছিন্ন। সর্বনাশা ক্যান্সারসম ক্রিকেট আমার সিস্টেম থেকে ফুটবলপ্রেমের শেষ বিন্দুটাও ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে গেছে।

আমি হায়দার কামিজের দিকে তাকালাম, আর খুবই বিনীতভাবে তার সালামের প্রত্যুত্তর দিলাম। ফরহাতও ততক্ষণে এসে আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছে।

আর ঠিক সেই সময়টাতেই, আমার মস্তিষ্কের যুক্তিবাদী অংশটা খেই হারিয়ে ফেলতে শুরু করলো। যতই বাস্তব, পরাবাস্তব আর অতিবাস্তবের সীমারেখা নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, যতই রাজ্যের ভূতের গপ্পো আর ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স ফিকশন গিলি, আমার আপাত ক্ষুরধার মস্তিষ্ক ভালোমতোই জানে যে কিছু কিছু জিনিস কক্ষনো সম্ভব না, যেমন গুলিস্তানের মোড়ে ক্রিসমাসের রাতে সান্তাবুড়োর নেমে আসা, বা এই কাকলীর রেইল ক্রসিংয়ে শীতের ঘন কুয়াশার মাঝে হায়দার কামিজের সাথে এই আমার দেখা হওয়া। এইসব কক্ষনোই সম্ভব না। এই আলাপচারিতা এইখানে হচ্ছে না। কিছু একটা ঠিক নেই ব্যাপারটায়।

হায়দার কামিজের মতো লোকজন কক্ষনো রাতের বেলায় রাস্তায় আজব পোশাক পরা একটা মোটা আর একটা অনেক মোটা ছেলেকে দেখে গাড়ি থামিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে না। হায়দার কামিজের মতো লোকজন গাড়ির টিনটেড কাচের ভেতর দিয়ে বিরক্তিকর দৃষ্টিতে এইসব ছেলেদের দ্যাখে আর ভাবে, 'কী মোটা সব পোলাপাইন! খুবই আনঅ্যাথলেটিক' আর ড্রাইভারকে বলে 'চালাও বারিধারার দিকে' - ওইখানে কোনো এক্সপ্যাটদের ক্লাবে বসে উত্তেজক পানীয়তে গলা ভেজানোর জন্য।

কিন্তু হায়দার কামিজের নিষ্পলক চাহনি তা বলে না। তাকে দেখেই মনে হয় ও সেইরকম একজন লোক যে নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে শীতার্ত (আর ভীত) দুইজন মানুষকে নিজের পরিচয় দেবে। ওদের ভড়কে যাওয়া বিস্ফোরিত দৃষ্টি দেখে নিজের মানুষজনকে ইমপ্রেস করার ক্ষমতা যাচাই করবে। আমি থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের কোনো ছবি দেখি নাই, কিন্তু আমি শিওর, তিন মাস্কেটিয়ারের আথোস (যার চেহারা হায়দার কামিজের মতো) কার্ডিনাল রিশ্যোলুকে (যেই ব্যাটা ভিলেন থাকে - দুষ্টু প্রধানমন্ত্রী), এইরকম চাহনি দিয়েই জরিপ করতো।

"আ- আ- পনি হায়- য়দার ক- ক্বামিজ?" আমার শুকিয়ে যাওয়া গলা দিয়ে প্রশ্নটা যেন ঠেলে বের হয়ে এলো।

দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড কেটে গেলো উত্তরের অপেক্ষায়। আমি টের পেলাম আমার ঘাড়ের পেছন দিয়ে বরফ শীতল ঘামের একটা স্রোত নেমে যাচ্ছে পিঠের মাঝ বরাবর। পেছন থেকে ফরহাত ফিসফিস করে বলছে 'চল দৌড় দেই।'

মোটেও ভালো আইডিয়া না। এই মোটা শরীরে এতো জামাকাপড় পরে দৌড়িয়ে সুবিধা করা যাবে না। আর যদি কোনো পিস্তলটিস্তল থাকে? গুলি করে দেয় যদি?

অনন্তকাল (মানে কয়েক সেকেন্ড) পরে উত্তর এলো,

'হ্যাঁ, আমিই হায়দার কামিজ'

আমি নিজেকে যুক্তিবাদী মানুষ বলেই মনে করি। পাড়ার বেকারির লোক এসে যদি বলে 'ভাইয়া, ভাইয়া, শিগগির আসেন, আমার পাউরুটির মধ্যে শহীদ জিয়ার ছবি ভাইসা উঠছে' তাহলে আমি মুক্তকচ্ছ হয়ে নাজিমের বেকারির দিকে দৌড় দেই না। ব্যাপারটা র‍্যাশনালি চিন্তা করি। রিচার্ড ডকিন্সের বইপত্র গুলে খেয়েছি, আমার মটো হলো 'কোয়েশ্চেন এভরিথিং,' তাই সবসময় প্রশ্ন করি। এইখানেও, জীবনের প্রবল ঝুঁকি সত্ত্বেও গলা একটু সামনে বাড়িয়ে আমি গাড়ির জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম, একটু ভালোমতো দেখার জন্য। আমার পেছন থেকে ফরহাতও ওর মুণ্ডু যদ্দূর সম্ভব উঁচু করে ধরল। ঠোঁটে না ধরানো সিগারেট। ভয়ের চোটে আগুন ধরাতে ভুলে গেছে ও।

নাহ, মোহামেডানের হয়ে খেললেও ভদ্রলোক মিথ্যা বলেন নি মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যেও যা দেখলাম, তাতে হায়দার কামিজ বলেই তো মনে হচ্ছে। তারপরেও বললাম,

"কী বলেন? আসলেই?"

"হ্যাঁ, আমি হায়দার কামিজ," উত্তর ভেসে এলো।

মনে হলো আমি হারুকি মুরাকামির জাদুবাস্তবতাময় গপ্পোগুলোর মধ্যে ঢুকে গেছি। এই কাকলী ক্রসিং, রাস্তা, রেললাইন কিচ্ছু নেই। চারপাশে গাঢ় কুয়াশা, নীলসবুজবেগুনি আলো আর আমরা দুইটা মোটা ছেলে আর বিখ্যাত ফুটবলার হায়দার কামিজ, প্রাক্তন অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। প্রাক্তন অধিনায়ক, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ইসি মেম্বার, বাফুফে। তাঁর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন জানালার বাইরে, আমাদের সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য। প্রমাণ করার জন্য যে উনি সবসময় ফুটবলারদের তারকারাজির মাঝেই বিচরণ করেন না। মাঝে মাঝে আমাদের মতো মরণশীল স্বাভাবিক মানুষদের আশেপাশেও নিঝুম শীতের রাতে মিশকালো এসইউভিতে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর তারকারশ্মি নির্মিত হাত খানা বাড়িয়ে দেন, করমর্দন করার জন্য।

আমি চোখ বন্ধ করে তাঁর হাতটা ধরলাম। ঝাঁকালাম। প্রতিটা মুহূর্তেই ভাবছিলাম এই বুঝি উনি দপ করে উধাও হয়ে যাবেন, পচা ডোবায় ব্যাঙের বিষণ্ন কোরাসের মাঝে জ্বলতে থাকা আলেয়া যেরকম দপ করে নিভে যায়, ঠিক সেইভাবে।

সেইরকম কিছু হলো না। হাতটা এক্কেবারে আসল একটা ডানহাত। ওই রেললাইন আর ট্রাফিক লাইটটার মতোই আসল। উনি আমার পরে ফরহাতের সাথেও হ্যান্ডশেক করলেন। ওঁর ড্রাইভার আমাদের দিকে তাঁর বিজনেস কার্ড বাড়িয়ে ধরলেন। আমরা একটু পিছিয়ে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে কার্ডের লেখা পড়ার চেষ্টা করলাম। দুই ভাঁজ করা বিজনেস কার্ড। সামনে ওনার স্ট্যাম্প সাইজ ছবি। হ্যাঁ! আসলেই ইনি হায়দার কামিজ। ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ছাড়াও গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। আবার উনি বাংলাদেশ হোসিয়ারি শিল্প সমিতির কী জানি কী।

ফরহাত ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, "দোস্ত, হোসিয়ারি আবার কী জিনিস? কোনো ইলিগাল ড্রাগ নাকি?"

আমি চাপা স্বরে বললাম, "কথা কইস না ব্যাটা! চুপ থাক!"

আবার শুনি হায়দার কামিজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর,

"কী করো তোমরা?"

আমি আর ফরহাত কেউই আমাদের আসল পরিচয় দিলাম না, বললাম, আমরা "ইস্টুডেন্ট।"

"কালকে সকালে আমাকে ফোন করবা, বিকেএসপিতে একটা ম্যাচ আছে বিকেলবেলা, তোমরা আসবা ওইটাতে। তোমাদের মতো একজনের আমার দরকার। বিশেষ করে ওই মোটা ছেলেটাকে" - ফরহাতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন তিনি।

মাথা নিচু করে ফেলে ফরহাত। ওর ওজন একশো তেত্রিশ কেজি। ছোটবেলা থেকেই ও ওর এই শারীরিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক কষ্টে আছে। অনেকের কাছে অনেক কথা শুনেছে। এখন হায়দার কামিজও ওকে ফুটবল খেলার কথা বলে উপহাস করার চেষ্টাই করছেন?

আমি ততক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছি, বললাম, "কিন্তু মিস্টার কামিজ, আমাদের তো ক্লাসটাশ আছে, আর আমরা তো প্লেয়ার না, আর ওকে দ্যাখেন... ওকে কি দেখে মনে হয় জীবনে কক্ষনো ও ফুটবলে লাথি দিয়ে দেখেছে?"

"তারপরেও- "

কথা আর শেষ করলেন না হায়দার কামিজ। সরসর করে কালো কাঁচ আবার উঠে গেল। মৃদু গুঞ্জন তুলে কালো টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বনানীর দিকে চলে গেল। আমরা দুইজন কুয়াশাঘেরা আলো-অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাস্তা কাঁপিয়ে একটা এইটিন হুইলার কনটেইনার ট্রাক ছুটে গেল। এইগুলা নতুন এসেছে শহরে। ছোটখাটো ভূমিকম্প তৈরি করে একেবারে। একটা ঘেয়ো কুকুর আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সেই আর্কটিক গিয়ারের মতো জাব্বাজোব্বা পরা পুলিশদেরকেও দেখা গেল এইদিকে আসছে। আমাদের পেরিয়ে গেল ওরা।

তারপরেই আবার সব শুনশান। আমরা কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছি। কিন্তু তখনো হাঁটা শুরু করি নি। কিন্তু জানি, রাত বাড়ছে, আর বেশিক্ষণ এইখানে থাকা ঠিক না। কিন্তু মাত্র দশ মিনিট আগে এইখান দিয়ে একটা ট্রেইনের যাওয়া, বা আট মিনিট আগে এইখানে সিগারেটওয়ালা মামুর কাছ থেকে ফরহাত প্রবলভাবে দরদাম করে দুই প্যাকেট সিগারেট কেনা, অথবা দুই মিনিট আগেও প্রখ্যাত ফুটবল ব্যক্তিত্ব হায়দার কামিজের সাথে আমাদের খুবই সংক্ষিপ্ত কথোপকথন... সবই এখন মনে হচ্ছে একটা পরাবাস্তব ব্যাপার।

এইটাই হয়ত জাদুবাস্তবতা। ম্যাজিক রিয়েলিজম।

তবে আর কিছু না হোক, হায়দার কামিজের বিজনেস কার্ডটা খুবই, খুবই বাস্তব একটা জিনিস।

কানামাছি

সুলতানা পারভীন শিমুল

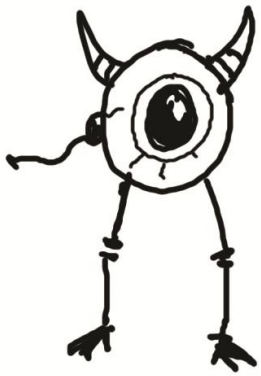

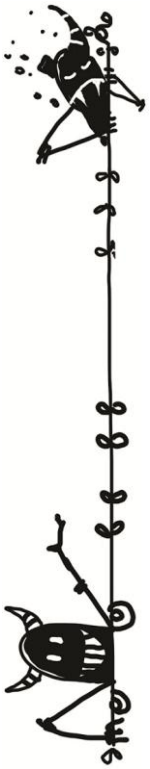

ছোটবেলা থেকে শুরু করে কিশোরীবেলা পর্যন্ত কেটেছে আমার চিটাগাংয়ে। উত্তর পতেঙ্গায়। ছিলাম একটা কলোনিতে। ক্যাম্পাসে গেইট দিয়ে ঢুকেই বামদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। শেষ মাথায় একটা চমৎকার পুকুর। আর তারপাশে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল দুটো তিনতলা বিল্ডিং। ব্যাচেলর'স কোয়ার্টার। সঙ্গত কারণেই এই সুন্দর পুকুরে মেয়েদের গোসলের কোনো সুযোগ ছিল না। তবে বাচ্চাদের জন্য আলাদা কথা। এখানকার পুকুরটা অন্যান্য বাচ্চাদের মতোই আমারও খুব পছন্দের ছিল, যতদিন পর্যন্ত না আমি জেনেছি এটাতে জোঁক আছে। জেনেছি মানে নিজের চোখে দেখেছি এক আংকেল একটা প্লেটে করে পাঁচ-ছয়টা জোঁক নিয়ে যাচ্ছেন বাকি সবাইকে দেখাবেন বলে। সবেমাত্র সাঁতার শেখার সমস্ত প্রচেষ্টা সেদিনই ধুলিস্মাৎ হলো আমার সেই ভয়ংকরতম দৃশ্য দেখে। আজও আমি সাঁতার জানি না।

গেইট দিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকলে প্রথমেই পড়ে অফিসার্স কোয়ার্টার। এটা চারতলা। আরো অনেকটা সামনের দিকে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ দূরত্ব রেখে তিনটে বিল্ডিং। এক নম্বর বিল্ডিং, এটা অবস্থিত সামনে। দুই নম্বর অবস্থিত এক নম্বরের সমান্তরালে অনেকটা পেছনে, আর তিন নম্বরটা অনেকটাই দূরে। খানিকটা ত্রিভুজাকৃতির অবস্থান। প্রত্যেকটা বিল্ডিং পাঁচতলা করে। প্রত্যেকটা তলায় ছয়টা করে ফ্ল্যাট। তিন নম্বরটা তুলনামূলকভাবে নতুন বিল্ডিং। শুনেছি এই বিল্ডিংগুলো হওয়ার আগে এই জায়গাটা শ্মশান ছিল। এবং যখন-তখন তেনারা নাকি দেখা দেন। ইনারা এতই শক্তিশালি, যে দিনের বেলাতেও অনেকের কাছেই তারা নির্ভয়ে আসেন, কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন। হয়ত মিলেমিশে থাকার প্রচেষ্টা। হাজার হলেও প্রতিবেশী।

জনশ্রুতি, গেইট থেকে যতটা ভেতরের দিকে যাওয়া যাবে, তেনাদের প্রভাব ততটাই বেশি অনুভব করা যাবে। সেই হিসেবে এক নম্বর আর দুই নম্বর বিল্ডিংয়ের বদনাম ছিলে অল্প। কিন্তু তিন নম্বর ছিল বিপদজনক। এবং প্রায়ই নানা ধরনের গল্পগুজব সেই ধারণাটাকে পোক্তই করে কেবল। এই তিন নম্বর বিল্ডিং ছাড়িয়েও অনেকটা দূরে, কিছু ধানক্ষেত-টেত পার হয়ে একটা পুকুর ছিল। পুকুরটার চারধার জুড়েই গাছ ছিল। অনেকটা আড়ালে বলে মহিলারা মাঝেমাঝে দল ধরে যেত গোসল করতে। এখানে একটা মেয়ে গোসল করতে এসে হারিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গীরা বলে, ডুব দিয়ে সে আর ওঠে নি। কিন্তু তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল সাতদিন পর। তাজা লাশ। দেখে নাকি মনে হয়েছিল, কয়েক ঘণ্টা আগেও বেঁচে ছিল।

আমরা ছিলাম এক নম্বর বিল্ডিংয়ের তিনতলায়। কী কারণে জানি না, আমি পরপর তিনরাত ভয়ংকর চিৎকার করেছি স্বপ্ন দেখে। ওটাকে শুধু ভয়ের স্বপ্ন বলতে অনেকেই নারাজ। কারণ একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখে আট-নয় বছর বয়েসি একটা মেয়ের চিৎকারে এইরকম অমানুষিক শক্তি ভর করতে পারে না, যেটা দিয়ে সে দুই দুইটা বিল্ডিংয়ের মানুষজনকে নিজের বাসায় টেনে আনতে পারে। এমনকি তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের কেউ কেউও নাকি শুনতে পেয়েছে সেই চিৎকার। মাঝরাতে আমাদের ঘর থিকথিক করতো প্রতিবেশীতে। মায়ের বুকের মধ্যে থেকেও আমার চোখে থাকত তীব্র আতংক। আমার মা বলতেন, আমি যে

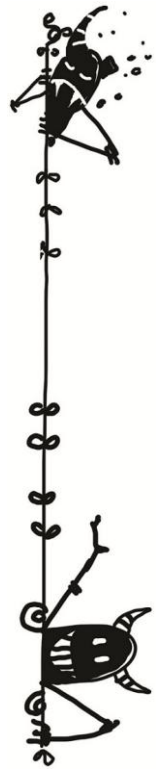

ঘরে থাকি, হয়ত আপনমনে খেলছি কিংবা পড়ছি, মাঝেমাঝেই নাকি সাদা শাড়ি পরা মুখঢাকা এক মহিলাকে দেখতে পেতেন সেই ঘরে উঁকি দিতে। কোনো না কোনো বাহানায় উনি এসে বসে থাকতেন আমার কাছে, আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন।

তিন নম্বর বিল্ডিংয়ে ছিলেন নাসির কাকা। তিন বছরের একটা বাচ্চা আর বউ নিয়ে থাকতেন তিনি চারতলায়। একদিন দুপুরবেলায় কীসব কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খাবার সময় হলে কাকি খেতে ডাকলে বললেন পরে খাবেন। ওদেরকে খেয়ে নিতে বললেন। বাচ্চাকে খাইয়ে দিতে গিয়ে কাকির খাওয়াও হয়ে যায়। অন্য ঘরে গিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দিতে বাচ্চার মা- ও ঘুমিয়ে পড়ল। ও ঘরে কাকা প্রায় উপুর হয়ে আছেন কাগজপত্রের ওপর। এমনসময় শুনলেন নারীকণ্ঠ। "দাদা যে এখনো লাঞ্চ করলেন না? শরীর খারাপ নাকি?" চমকে উঠে তাকালেন নাসির কাকা। প্রীতিলতা আন্টি। উনাদের কলিগ। থতমত গলায় বললেন কাকা, "তু- তুমি?" "হ্যাঁ, আমি। একা একা থাকতে আর ভাল্লাগছিল না। চলে এলাম। ভাবলাম, আপনাদের সাথে একটু গল্প করি। ও মা! তা ওরা তো ঘুমাচ্ছে। তা, আপনি কী করছেন দেখি?" প্রীতিলতা আন্টি হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাকা পিছিয়ে গেলেন। কালো কালো বিশাল লোমে ভর্তি আন্টির হাত।

কিছুক্ষণ পরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনে কাকি এ ঘরে এসে দেখেন, কাকার মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুচ্ছে। চেঁচামেচি করে প্রতিবেশী জড় করেন তিনি। মাথায় পানিটানি ঢেলে বাতাসটাতাস করে একটু ধাতস্থ হন কাকা। প্রীতিলতা আন্টি মারা গেছেন প্রায় দশদিন আগে।

তিন নম্বর বিল্ডিং পার হয়ে যে পুকুরটার কথা বলেছিলাম, শুনলাম, ওখানে গোসল করতে যাচ্ছে কোন কোন আন্টি আর কাকিরা। বড় আপুরাও কেউ কেউ যাবে। আমরা ছোটরা ঠিক করলাম আমরাও যাব ওদের সাথে। গেলাম। সব মিলিয়ে পনেরো- ষোলো জন। আমাদের গ্রুপের চার- পাঁচজন। গাছপালা থাকার পরেও পুকুরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে আমার কাছে। পাড়ের ওপর কাপড়চোপড় রাখি আমরা। কাপড়চোপড় মানে গামছা আর প্যান্ট। তারপর বড়দের সাবধানবাণী শুনতে শুনতে নেমে যাই পুকুরে। আমরা ফিসফিস করে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার কথা বলাবলি করতে থাকি। আন্দাজ করতে থাকি, কোথায় ও নেমেছিল, আর কোথায় ওকে পাওয়া গেছে। একজন আবার চোখ পাকিয়ে নিষেধ করল এইসব কথা না বলতে। তেনারা শুনে ফেললে সমস্যা।

দল বেঁধে গোসল করাটা একটা উৎসবের মতো। চুপচাপ গোসল করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। উচ্ছলভাবে গল্পগুজব চলছে। কেউ এক ডুবে কতদূর যেতে পারে, কেউ চিৎসাঁতার, কেউবা কাপড় ধুচ্ছে, যারা সাঁতার জানে তারা যথেষ্ট দূরে চলে গেছে। আমরা কয়েকটা অল্প পানিতে লাফালাফি করছি। আমি আর কাজল, কে কতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে, তার প্রতিযোগিতায় নামলাম। ডুব দিয়ে উঠে একবার দেখলাম, কাজল তখনো পানির নিচে। ও জিতে যাবে, তা তো হয় না। লম্বা দম নিয়ে আমি হাসিমুখে আবারও ডুব দেই। জিতব তো আমিই। পানির নিচে চোখ খুলে কাজলকে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করি। হলদেটে এক ধরনের ঝাপসা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দম ফুরিয়ে গেলে ভুস করে ওপরে উঠি আমি। উঠেই ঠাস করে একটা চড় খাই যেন। সারা পুকুর জুড়ে একটা মানুষও নেই। তা কী করে হয়! কুঁকড়ে যাওয়ার মতো ভয়ংকর অনুভূতি! কী করব বুঝতে পারছি না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি, ওদের হাসি, ওদের কথা, এমনকি কাপড় কাচার শব্দ। কিন্তু চোখের সীমানায় কেউ নেই। আমি ভয়জড়িত গলায় ফিসফিস করে ডাকি, "কাজল..."

মাঝপুকুরে কোনো তরঙ্গ ছাড়াই আস্তে করে ভেসে ওঠে একটা মাথা। একবার মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো মুখটা। এ তো আমাদের সাথে আসে নি। অচেনা মুখ। স্থির দৃষ্টি। আমার ভয় বাড়তে থাকে। পাড়ে উঠে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে, কিন্তু জোর নেই হাঁটুতে। আমার ভেজা মুখের সাথে চোখের পানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মেয়েটা এবার আমার দিকে চোখ রেখেই এগিয়ে আসতে থাকে। কোত্থেকে নড়ার শক্তি পেলাম কে জানে। সমস্ত

ক্ষীপ্রতা নিয়ে আমি পানি থেকে উঠে আসার জন্য ঘুরলাম। এই সময়ে পানির নিচ থেকে আমার পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কে যেন। এক টানে পানির নিচে। পা ছাড়ানোর চেষ্টা করছি আর সমানে পানি খাচ্ছি। শুধু পা না। কে যেন বাহু চেপে ধরলো আমার। আমি সেই হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করি প্রাণপণে। কিন্তু এক ঝটকায় পানির ওপরে তুলে আনে আমাকে সেই হাত।

আমি তখনও সমানে ঢোক গিলছি। চারদিকে তাকিয়ে দেখি সব আগের মতোই। আমার চোখেমুখে দিশেহারা ভাব দেখে হেসে ফেলে কেউ কেউ। হাতের মালিক আরেকটা ঝাঁকুনি দেয় আমাকে। রাশেদা আপা। "এইদিকে আসছিস ক্যান? খাদের মধ্যে তো পড়ছিলি। বেশি পানি খাইছিস?" কোনোমতে মাথা নাড়ি আমি। কাজল আর আরো কয়েকটা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে, যেখানে ছিলাম আমরা।

সেই ঘটনার রেশ আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল বহুদিন। যতদিন ছিলাম, ওই পুকুরে আর যাই নি কখনও। নিশ্চয়ই এই ঘটনাগুলোর কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে। মাঝেমাঝে গা ছমছম করা অনুভূতি হলেও আদতে ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু পুরোনো দিনের এই কথাগুলো মনে পড়লে মনে হয়, কিছু ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে জীবন বড় পানসে হয়ে যায়। নাতি- নাতনির কাছে গল্প করার জন্যও তো কিছু মালমশলা দরকার।

ব্রহ্মদত্যির গল্প

সত্যপীর

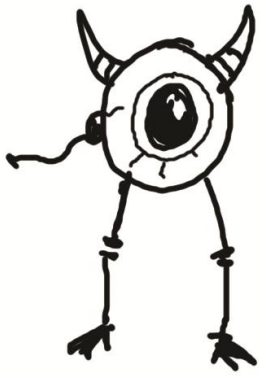

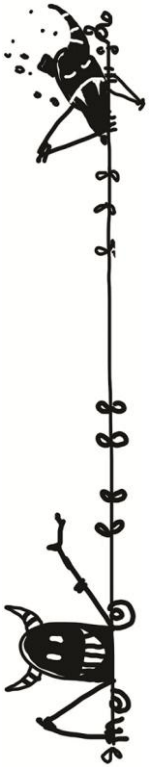

মেলাদিন আগে ছিল এক গরীব ব্রাহ্মণ আর তার বউ। টাকাপয়সার বড়ই টানাটানি, ঘরে ঘরে ভিখ মেগে যে কয়মুষ্টি চাল পেত, ওইটেই ফুটিয়ে খেত তারা। একদিন গ্রামে জমিদার বদল হলো, তাই ব্রাহ্মণ সেলাম ঠুকতে নয়া জমিদারের কাছারিতে গেল। জমিদার তখন গ্রামের বিবিধ খবরাখবর বুঝে নিচ্ছিল, আর কে যেন একজন বলছিল যে গ্রামের একটু বাইরে একটা বটগাছে অনেকগুলি ভূতের আস্তানা। যারাই রাতের বেলা ঐ বটগাছের নিচ দিয়ে গিয়েছে তাদের সকলেরই ঘাড় মটিতং। তাই আঁধার নামার পর ঐ গাছের পাশ ভুলেও কেউ মাড়ায় না।

জমিদার ভারি আমোদিত হলেন এই খবরে। তিনি বললেন কেউ যদি রাতের বেলা ঐ বটগাছের দুইটা ডাল ভেঙে নিয়ে আসতে পারে তবে তাকে শ বিঘা খাজনাবিহীন জমি প্রদান করা হবে। এতে তেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো না, ঘাড় মটকে গেলে শ বিঘা জমি দিয়ে হবেটা কী শুনি? ব্রাহ্মণ কিন্তু অন্য চিন্তা করছিল। সে ভাবল, আমি যে বেঁচে আছি এইটাই তো আচ্চইজ্জ ব্যাপার। আমার সামনে তিনটে অপশন। অপশন এক, সাফল্যের সহিত ডাল কেটে আনা এবং রাজার হালে জীবনটা কাটিয়ে দেয়া। অপশন দুই, ব্যর্থতার সহিত ডাল কেটে আনা এবং ভূতের হাতে ইন্নালিল্লা। অপশন তিন, ডাল কাটার চেষ্টা না করা এবং না খেয়ে মরা। ঘাড় মটকে মরা আর না খেয়ে মরার মধ্যে ডেসপারেট ব্রাহ্মণ তেমন তফাত খুঁজে পেল না, তাই সে হাত তুলে বলল রাতে সে চেষ্টা দিবে ডাল কাটার।

জমিদার ভারি খুশি ভলান্টিয়ার পেয়ে। তিনি বললেন ডাল আনলে জমি নিশ্চিত। বাকিরা কিন্তু ব্রাহ্মণকে নিষেধ করার চেষ্টা করল, এমনকি তার বউও বলল না যেতে। ব্রাহ্মণ অনড়। সে বউকে বলল মারা এমনেও যাব অমনেও যাব, দেখি না কী হয়। আঁধার নামার ঘণ্টাখানেক বাদে সে রওনা দিলো, আর বটগাছের অল্পদূরে একটা বকুলগাছের তলায় গিয়ে থামল। তার বুক ধুকপুক করছিল, এতক্ষণ পর তার ভয় লাগা শুরু হলো।

ব্রাহ্মণকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বকুলগাছের ডগা থেকে নেমে এল এক ব্রহ্মদত্যি। সে হাঁকল, "ওহে বামুন, ঘটনা কী? ডরাইসো? আমি ব্রহ্মদত্যি, তোমার ভয় নাই। কী চাও বলো।" ব্রাহ্মণ বলল, "হে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মদৈত্য, আমি যদি ঐ বটগাছের দুইটা ডাল কেটে জমিদারের কাছে নিয়ে যাই তবে শ বিঘা জমি দেবে বলেছে। বড় গরীব গো দৈত্যদাদা, ডালদুটি পেলে বিরাট উপকার হয়।" ব্রহ্মদৈত্য বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, এ আর এমন কী। নির্ভয়ে যাও বটগাছের তলে, আমি আসছি তোমার সাথে।"

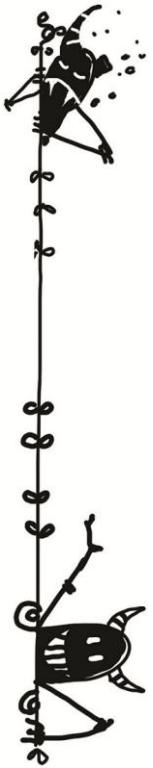

বটগাছের তামাম ভূত লাফ দিয়ে ছুটে এলো...

ব্রাহ্মণ বুকে বল পেল, এগিয়ে গেল সে বটগাছের দিকে। তাই না দেখে বটগাছের তামাম ভূতের দল লাফ দিয়ে তার দিকে ছুটে এলো। তখনই শোনা গেল ব্রহ্মদত্যির হুঙ্কার, "সামলে! এই লোকটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সে ডাল কেটে নিলে তার ভারি উপকার হবে। আমার ইচ্ছা সে নির্ভয়ে দুইটা ডাল কেটে নিয়ে যাবে।" ভূতের দল অমনি সেলাম ঠুকে বলল, "রজার ক্যাপ্টেন, কোনো অসুবিধা নাই। উনার ডাল কাটার তকলিফ করার দরকার কী? আমরাই ডাল কেটে দিচ্ছি খাড়ান।" চোখের পলকে ধাঁই ধাঁই করে ডাল কেটে দেয়া হলো, আর ওইটে বগলে চেপে ব্রাহ্মণ দিলো ছুট জমিদারবাড়ি।

পরদিন সকালে লোকলস্কর নিয়ে জমিদার বটগাছের দিকে হাঁটা ধরলো, ব্যাটা আসলেও কেটেছে না অন্য গাছের ডাল ধরিয়ে দিলো দেখতে হচ্ছে। গিয়ে তো তাদের চক্ষুস্থির, কী রে ডাল তো আসলেও মিসিং! জমিদার ভারি খুশি হয়ে ব্রাহ্মণকে শ বিঘা জমি দান করলেন। জমি পেয়ে ব্রাহ্মণ দেখল ন্যাড়া জমি নয়

রীতিমত ফসলে নুয়ে পড়া জমি। এইবার ফসল কাটার ব্যবস্থা করতে হয়। ব্রাহ্মণের পকেট ফুটো, সে খাটানোর মজুর ভাড়া করবে কীভাবে? এত এত ফসল কি তবে যাবে নষ্টদের অধিকারে? চিন্তা করে করে সে আবার তার অশরীরী বন্ধুদের সাহায্য নেবে ঠিক করল। রাতে আবার গিয়ে সে ধরল বকুলগাছের ব্রহ্মদৈত্যকে। বলল, "সুপ্রিয় দৈত্যমশাই, নতুন সমস্যা। জমি পাইলাম এখন ফসল কাটি কেমনে?" ব্রহ্মদত্যি লোক ভালো। সে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, চিন্তা করো না। শুধু যে ফসল কেটে দেয়া হবে তাই না, নট ওনলি বাট অলসো, তোমার ফসল মাড়াই করে গোলায় ভরেও দেবার ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও। একটা কাজ করো, ধার করে শ'খানেক কাস্তে রাতের বেলা গাছের তলে রেখে যেও। আর গোলা ইত্যাদির জায়গাটাও চিহ্ন দিয়ে রাখো।"

খুশিতে ব্রাহ্মণের দাঁত বেরিয়ে গেল। শ'খানেক কাস্তে জোগাড় হয়ে গেল সহজেই, গ্রামের লোকে জেনে গেছে তার আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার কথা। গোবর দিয়ে লেপেটেপে সে গোলার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখল, তারপর দিলো ঘুম।

গভীর রাতে ব্রহ্মদত্যির কমান্ডে নেমে এলো ভূত ব্যাটালিয়ন। মিশন ধান কর্তন। একশ ভূতের দায়িত্বে পড়ল একশ বিঘা, ভূত প্রতি এক বিঘা। সারাদিনে মানুষ যে পরিমাণ ধান কাটে ভূতে তা কাটে মোটে এক মিনিটে। সাঁই সাঁই পন পন শব্দে জমি মুখর হয়ে উঠল আর অদৃশ্য হাতের কাস্তে দিয়ে কাটা ধান অন্যান্য অদৃশ্য হাতে তুলে গোলায় ভরে রাখা হতে থাকল। এরপরে চলল মাড়াই, আর চাল একদিকে আর খড় আরেকদিকে জমা হতে লাগল দ্রুত। সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা আগেই মিশন খতম, ভূতেরা গিয়ে তাদের বটগাছে দিলো ঘুম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাহ্মণ আর বউ গোলাভরা ধানের পাহাড় দেখে খুশিতে দিলো লাফ। গাঁয়ের লোকে ভিড় জমালো এই অশরীরী কাণ্ড দেখে, আর বলাবলি করতে লাগলো এ নিচ্চয় দেবতাদের কাজ।

দিনকয় পরের কথা। ব্রাহ্মণ আবার গিয়ে হাজির বকুলতলায়। "সুপ্রিয় দৈত্যমশাই," বলল সে, "দেবতাদের অনুগ্রহে আজ আমার আর কোনো দুঃখ নাই। এইবার আমি এক হাজার ব্রাহ্মণভোজন করাতে চাই।" ব্রাহ্মণজাতের অ্যালামনাই ব্রহ্মদত্যি ভারি খুশি হয়ে বলল, "অবশ্যই, সে তো অতি সুখের কথা। দাঁড়াও তোমাকে আমি বাজার করে দিচ্ছি।" কোথা থেকে হাজির হলো একশ বোতল ঘি, এক পাহাড় ময়দা, একশ বোতল চিনি, একশ বোতল দুধ আর দই আর কত হাজার টুকিটাকি। পরদিন একশ বামুনঠাকুর রান্নাবান্না করে বিরাট ভোজ দিলো, আর হাজার ব্রাহ্মণ এলো সেই ভোজ খেতে। আমাদের ব্রাহ্মণ কিছু খেল না, সে বসেছিল রাতে ব্রহ্মদত্যির সাথে একসাথে খাবে বলে। ব্রহ্মদৈত্য কিন্তু খেল না, বরং বলল গুড নিউজ! তার ইদানীংকালের শুভকাজে খুশি হয়ে আকাশের দেবতারা তার মেয়াদ মকুব করে দিয়েছেন আর স্বর্গে যাবার পুষ্পক রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সেই থেকে ব্রহ্মদত্যি আর ব্রাহ্মণ দুইজনে দুই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।

.....

১৯১২ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড লাল বিহারী দে রচিত "Folk Tales of Bengal" বইয়ের "The Story of a Brahmadaitya" গল্পটির ভাবানুবাদ। Warwick Goble অঙ্কিত চিত্রটি একই বই হতে নেয়া।

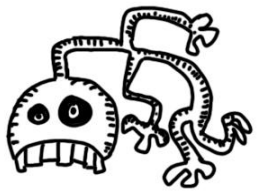

ভূত

তাসনীম
tmhossain@gmail.com

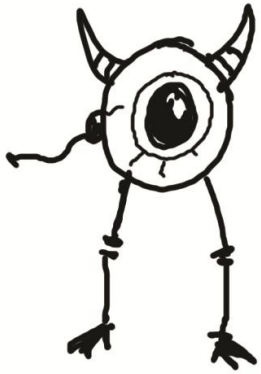

আমাদের ছোটবেলাতে এই ঢাকা শহরে ভূতের কোনো অভাব ছিল না। আমাদের তেজগাঁয়ের গির্জার কবরস্থানে তেনারা ছিলেন বহাল তবিয়তে। গির্জার পাশের রাস্তাটা রাতে একদম নিস্তব্ধ হয়ে যেত, মানুষজন দোয়া- দুরুদ পড়ে যাওয়া- আসা করতো। ওরা সব্বাই ছিলেন বিদেশি ভূত। বছরের পর বছর এই দেশে থাকতে থাকতে আমাদের বন্ধুর মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাসায় প্ল্যানচেট করলে সব পর্তুগীজ ভূত আসতো। ওদের স্বভাব ছিল মোলায়েম। তবুও রাতে ওদের ভয়ে বাথরুমে যেতাম না। আমাদের বাসার বাথরুম থেকে গির্জার কবরস্থান দেখা যেত। ঘুমঘুম চোখে কবরস্থানের টিমটিমে আলোতে অনেকবারই ছায়ামূর্তি দেখেছি আমি।

শুধু বাসা নয়, আমাদের স্কুলেও ভূতের উপদ্রব ছিল। বায়োলজি ল্যাবের কঙ্কালটা নাকি রাতে করিডোরে হাঁটাহাঁটি করতো। বিশেষত গ্রীষ্ম বা রোজার বন্ধের সময় তার সময় একদমই কাটতো না। যদিও ঘণ্টাবাদক মালুম ভাই ছাড়া ওকে আর কেউই দেখে নি। কিন্তু সেই গল্প শুনেই ছুটির পরে শেষ বিকালের আলোয় আমাদের সেই প্রিয় স্কুল ঘরটাও কেমন ভুতুড়ে মনে হতো। এছাড়াও ঢাকা কলেজের পুকুরে আততায়ী শেকল, পেছনের জঙ্গলে ভৌতিক বিড়াল, ভূতের গলিতে, ভৌতিক বাড়ি, শীতের, রাতের রমনা পার্ক - সব মিলিয়ে ঢাকা খুবই ভূতবান্ধব একটা শহর ছিল। ভূতহীন শৈশব একদম পানসে লাগে আমার কাছে।

ভূতের চেয়ে জীবিত মানুষ অনেক বেশি ভয়ংকর সেটা বড় হতে হতে বুঝেছি। আমি যতই বড় হতে থাকলাম, ঢাকা শহরও ততই বড় হতে লাগলো। আমার উচ্চতা একটা সীমানাতে থেমে গেলেও আমার প্রিয় শহর শুধুই উপরে উঠতে লাগলো। সেই ক্রমবর্ধমান শহর থেকে ভূতদের পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। এতো দাম দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবে কোন ভূত? কারও বাসাতে ভূতের উপদ্রব হলে বাসার মালিক নিশ্চিতভাবে ভূতের কাছে ভাড়া চাইবে। বিনা পয়সায় একটা উটকো জিনিস কে পালবে? ভাড়া দেওয়ার মতো এতো পয়সা ভূতরা কোথায় পাবে? এক সময় সেই ভূতদের মতো আমিও পালিয়ে গেলাম সেই শহর থেকে।

এমনি এক ভূতহীন শহরে বেড়াতে গেলাম গত বছর দুয়েক আগে। এপ্রিল মাসের প্রখর রোদ্দুর মাথার ওপর, রাস্তায় জ্যাম, বাসায় বিদ্যুৎ নেই, কলে পানি নেই, ঘরে বুয়া নেই, আইনশৃঙ্খলা নেই, মাঠে ঘাস নেই... নেই... নেই... নেই... নেই... পুরো শহর জুড়ে শুধু নেই নেই হাহাকার... আর হ্যাঁ আমার পুরোনো স্মৃতির লেশমাত্র নেই।

ঢাকার বাইরে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসলাম, সেখানেও নেই নেই ধ্বনি। প্রতিটি মানুষই আমাকে বিদেশ থেকে ফিরতে মানা করলো, প্রত্যেকেই জানালো যে আমি অনেক সুখেই আছি। শহরের সব মানুষই মনে হয় অন্তরে কোনো "অসুখ" ধারণ করেন। এই শহর থেকে অতি দূরের কোনো বিদর্ভ নগরে

পালালেই মনে হয় সেই জ্বালা জুড়াবে। আমার ছেলেবেলার সঙ্গী শহরটাকে আজ আর কেউ ভালোবাসে না... না ভূত... না মানুষ।

দেখতে দেখতে চারটা সপ্তাহ চলে গেল, এবার বিদায় নেবার পালা। ফিরে যাওয়ার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। বাচ্চাদের নিয়ে বউ বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন জানি বাদ দিতে হয়েছে।

এখন আর তেজগাঁয়ে থাকা হয় না। লালরঙের এক মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ির পাঁচতলায় থাকি আমরা। পেছনে একটুখানি আকাশ দেখা যায়। দুপাশেই একই আকারের দুটো মস্ত বড় বাড়ি। চাইলে আমাদের বারান্দা থেকে ওদের বারান্দাতে লাফিয়ে চলে যাওয়া যায়, এমনি কম দূরত্ব দুটো বাড়ির মধ্যে। ঢাকা শহরের জমির প্রচণ্ড দাম, এক ইঞ্চিও কেউ ফেলে রাখতে নারাজ।

খালি ঘরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। পাশের বাড়ির বাচ্চাদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছ, মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ওদের কান মলে দিতে পারবো। বুয়াকে ধমকালেন বেগম সাহেব, টিভির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কোথাও যেন, জীবন প্রবাহমান। বাইরে রাতের আকাশে মেঘ নেই এক ফোঁটা, ঠিক এমনি এক সময়ে - লোডশেডিং।

সারাজীবন এয়ারকুলার ছাড়াই বড় হয়েছি, কিন্তু বর্তমানে এমনি এক লাটসাহেবে পরিণত হয়েছি যে ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়া আর ঘুমাতে পারি না। এক সময়ে প্রবল গরমেও দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাতে পারতাম। কারেন্ট কখন আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই... এখন সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ঘরটা ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়া।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। তখন কয়টা বাজে কে জানে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ এসেছে - বলা যায় না হয়ত বারকয়েক গিয়েছেও। বাইরে আর কোনো আওয়াজ নেই, আশেপাশের অট্টালিকার সব্বাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ বাথরুম থেকে টিপ... টিপ... টিপ... টিপ... টিপ... টিপ শব্দ। ঠিক সেই শব্দ শুনতাম ছোটবেলাতে। ভয়ার্ত স্বরে আম্মাকে জিজ্ঞেস করতাম ওটা কি ভূত? আম্মাও ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিতেন... হুম... তবে ছোট ভূত ওগুলো, ভয়ের কিছু নেই। একটু বড় হওয়ার পরে আমি রাতে কল ভালো বন্ধ করেও ওই শব্দ শুনেছি। সারারাতব্যাপী শব্দ নয়, রাতের কোনো একটা সময়ে অল্প কিছুক্ষণ চলা টিপটিপ শব্দ। আমি বাথরুমে ঢুকলেই সেই শব্দ বন্ধ হয়ে যেতো।

নাহ... এইবার আর ভয় নয়... বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি পাশের বাথরুম থেকে শুনলাম টিপ... টিপ... টিপ... টিপ... টিপ... টিপ... খুব মনোযোগ দিয়ে... যেন হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর গল্প শুনছি। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে ওই ছোট্ট ভূতের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। আহ বেচারা নিশ্চয় অনেক দূর থেকে এসেছে আমার সাথে দেখা করতে। বলা যায় না, হয়ত ওই ছোট্ট ভূতটা এখনো এখানেই থাকে... এই মনুষ্যবাসের অনুপযোগী শহরে রয়ে গেছে... আমারই জন্য হয়ত। মানুষদের দোয়া করে বলতে হয়... "বেঁচে থাকো বাবা," ভূতদের দোয়া করতে হলে কী বলতে হয়? আমার চোখ জড়িয়ে আসে... ওই টিপ টিপ শব্দটার মধ্যে কোথাও যেন অনেক দূরের দুরন্ত এক আনন্দ লুকিয়ে আছে।

যাক এই শহরে আমাকে সবাই ভুলে যায় নি... মাঝে মাঝে হঠাৎই তারা ফিরে আসে... একদম বুকের কাছেই।

“এই ভূত ভূত নয়...
আরো ভূত আছে...”